রাজশাহীর আদিবাসী সম্প্রদায়

ধর্মান্তর ও সাংস্কৃতিক সংকট

হারুন-অর রশিদ সরকার

সাঁওতাল, ওরাওঁরা এদেশেরই মানুষ। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান-হিন্দু অধ্যুসিত এ দেশেই তাদের বসবাস। এদেশ শত শত বছর ধরে হিন্দু ও মুসলিম শাসকরা সুনাম ও সুখ্যাতির সাথে রাজত্ব করেছে। সামাজিকভাবেও আদিবাসীরা হিন্দু-মুসলমানদের সাথে একই এলাকাতে বসবাস করে এসেছে। অথচ তারা এই দু'টি ধর্মের কোনটার প্রতিই ঝুকে পড়েনি। হিন্দু ধর্মে তো আত্মীকরণের কোন সুযোগই নেই। মুসলমানরা একটা মিশনারী জাতি হলেও বাংলাদেশের আদিবাসীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেনি মুসলমান সমাজ। শত শত বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের এই উপেক্ষিত মনোভাব আদিবাসীদের উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলেছে। ফলে তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের প্রতি ঝুকেছে। এই ধর্মান্তর তাদের নিজস্ব উৎসব-অনুষ্ঠানের ধরণ ও ধারা পাল্টে দিয়েছে। এই প্রবণতা যদি অব্যাহত থাকে তবে এমন একদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন সনাতনপন্থী একজন আদিবাসীকেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারা ধর্মান্তরিত হচ্ছেন, সঙ্গে বিলুপ্ত হচ্ছে এদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল ধারা ...

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাজশাহীর আদিবাসী সম্প্রদায় : ধর্মান্তর ও সাংস্কৃতিক সংকট

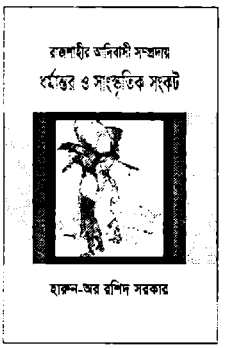

হারুন-অর রশিদ সরকার

পরিবেশ

www.pathagar.com

রাজশাহীর আদিবাসী সম্প্রদায় : ধর্মান্তর ও সাংস্কৃতিক সংকট
হারুন-অর রশিদ সরকার

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০০৭

স্বত্ব
শাহানাজ পারভীন মুন্নি

প্রকাশক
পরিলেখ
পরিচয় প্রাঙ্গণ, কাজীহাটা
গ্রেটার রোড, রাজশাহী ৬০০০

পরিবেশক
মিজান পাবলিশার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা)
ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের 'সাঁওতাল দম্পতি' (জলরঙ, ১৯৫১ সাল) অবলম্বনে
ম. ইয়াহিয়া সেলিম

মূল্য
আশি টাকা

RAJSHAHIR ADIBASHI SOMPRODAI: DORMANTOR O SANGSKRITIK SONGKOT
(The Aborigines of Rajshahi : Converson and Cultural Crisis) By Harun-or Rashid Sarkar, Published by *Parilekh*, Rajshahi. Frist Edition: *Ekushe Boi Mela* 2007. Price: Taka 80 Only.

ISBN 984-300-000267-1

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মা
রছিমন নেছা
বাবা
হাবিবুর রহমান সরকার

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খ্রিস্টান সাহায্য ও সেবা সংস্থাসমূহ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বিশেষ করে এদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মাঝে ঐসব সেবাসংস্থার কর্মকান্ড চোখে পড়ার মত। লক্ষ্যণীয় যে, দেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অবস্থানরত গরীব ও অসহায় আদিবাসীদের মাঝে খ্রিস্টান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বিভিন্ন কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মাঝে মিশনারী কর্মকান্ডের প্রভাব জাতীয়ভাবে ব্যাপকভাবে আলোচনায় উঠে এসেছে। বিশেষ করে, রাজশাহী অঞ্চলের আদিবাসীদের মাঝে তাদের কার্যক্রম এবং এর ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সমাজ গবেষকদের কাছে উৎসাহের জন্ম দিয়েছে। একই সাথে মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের ধর্মান্তরের ফলে যে নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে, তাও একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে আলোচনায় এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে আমি রাজশাহীর আদিবাসী সম্প্রদায়ের মাঝে খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী হই এবং এ বিষয়ে গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল ডিগ্রী লাভ করি। ঐ গবেষণা কর্মে নিযুক্ত থাকাকালে (১৯৯৮-২০০১ খ্রি.) আমি রাজশাহীর সবকটি খ্রিস্টান গ্রুপের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীসমূহ মাঠ পর্যায়ে ঘুরে ঘুরে অবলোকন করেছি। সেই সময়ের গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তের ওপর নির্ভর করে এই গ্রন্থখানি লিখিত। এতে বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আগমন ও তাদের প্রাথমিক দিনগুলিকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি রাজশাহী জেলায় তাদের সকল কর্মকান্ডকেই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছি। একই সাথে আদিবাসীরা কেন খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে এবং এর ফলে তারা কিরূপ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে আর কি কি সুযোগ সুবিধাই বা তারা পাচ্ছে, তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থটি প্রকাশের এই মুহূর্তে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শিক্ষক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ইমেরিটাস ডঃ এ বি এম হোসেন ও একই বিভাগের প্রফেসর ডঃ সুলতান আহমদ এর প্রতি। তাঁরা দু'জন আমার এম.ফিল গবেষণাটির সুপারভাইজার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া আমার গবেষণাকালীন সময়ে ফোকলোর বিভাগের প্রফেসর আবদুল জলিল বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। তিনি আদিবাসী সাওঁতাল ও ওঁরাও সম্প্রদায়ের ওপর বেশ কয়েকটি মৌলিক গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন -যা খুবই মূল্যবান। আমি তাঁর রচনা থেকে যথেষ্ট তথ্য গ্রহণ করেছি, তিনি আমাকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও দিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতি অশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। এ ছাড়াও ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর মাহবুবুর রহমান, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, সমাজকর্ম বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম আমাকে কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন, আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার বন্ধুদের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, কবি ও গবেষক ডঃ মাহফুজুর রহমান আখন্দ, রাজশাহী সরকারী কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক, কবি ও গল্পকার আবু নোমান মোঃ আসাদুল্লাহ, ঢাকার সরকারী বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক খাজা মোঃ জিয়াউল হক, সরকারী তিতুমীর কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি গবেষক অধ্যাপক আব্দুল কাদের ও জনাব এ টি এম রফিকুল ইসলাম এবং স্নেহভাজন কবি ও গল্পকার নূরুস সা'দত, কবি ও গবেষক ফজলুল হক তুহিন নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, যা ভোলার নয়। আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ।

গবেষণা কর্মটি শেষ পর্যায়ে আনতে এবং এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে পুরো সময়জুড়ে সবচেয়ে বেশী কষ্ট করেছেন আমার সহধর্মিণী শাহানাজ পারভীন মুন্নি। আমার দুর্লভ পাওয়া এই যে, লেখাপড়ার খাতিরে তিনি সংসারের অনেক দায়-দায়িত্ব থেকে আমাকে মুক্ত রাখেন। এই সুযোগে আমি তার অকৃত্তিম অবদানের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটি প্রকাশের আগ্রহ ও উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ডাঃ নাজিব ওয়াদুদ এবং রাজশাহীর পরিলেখ প্রকাশনীর সংশ্লিষ্ট সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

সর্বোপরি, সকল কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহ পাকের জন্য।

হারুন-অর রশিদ সরকার
রাজশাহী

০১ ফেব্রুয়ারী ২০০৭

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : পটভূমি: খ্রিস্টান সম্প্রদায় ও রাজশাহীর আদিবাসী ৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : আদিবাসীদের মাঝে খ্রিস্টান মিশনারী কর্মকাণ্ড ৩১
মিশনারী প্রতিষ্ঠান ও এনজিও
বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠানসমূহ
রাজশাহীর আদিবাসীদের মাঝে মিশনারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম

তৃতীয় অধ্যায় : আদিবাসীদের ধর্মান্তর কার্যক্রম ও তার প্রভাব ৭৪
খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধি
শিক্ষা বিস্তার
ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি
জনগণের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর আঘাত

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি ৯৬

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি

খ্রিস্টান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও তাদের অঙ্গ সংগঠনের কর্মতৎপরতা গোটা বাংলাদেশে জালের মত ছড়িয়ে আছে এবং বর্তমানকালে মিশনারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের মধ্যে পরিবর্তন ও নতুনত্ব এসেছে। এক সময়ের প্রার্থনা অনুষ্ঠান, বাইবেল পাঠ আর স্কুল পরিচালনা -এ জাতীয় কাজ থেকে উত্তরণ ঘটে, বর্তমানে মানব সম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্র পর্যন্ত তাদের পদচারণা রয়েছে। আর এ সব কিছুই পরিচালিত হচ্ছে গ্রামের নিভৃত পল্লী, সীমান্ত এলাকা, গহীন অরণ্য কিংবা পার্বত্য এলাকা থেকে শুরু করে শহর-নগরে, যেখানে রয়েছে আদিবাসী কিংবা সংখ্যালঘিষ্ট জনগোষ্ঠীর বসবাস। পুরাতন একটি জেলা হিসেবে রাজশাহী খ্রিস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে এসেছে অনেক আগেই। ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে এখানে ফরাসী, ইংরেজরা এসেছে, এসেছে মিশনারীরা। রাজশাহীর ইতিহাসের সাথে মিশে আছে মিশনারীদের অবদান ও কর্মকান্ড। বর্তমানকালেও রাজশাহী জেলাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খ্রিস্টান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্মরত আছে। রাজশাহী জেলায় প্রটেষ্ট্যান্ট, ক্যাথলিক, এ্যাডভেন্‌টিষ্টসহ প্রায় সকল খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অনুসারী ও তাদের কাজ আছে এবং প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায়েরই ধর্মীয় কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা, চিকিৎসা, আর্থিক ও সামাজিক কার্যক্রমও রয়েছে। মজার বিষয় হলো, এসকল কাজ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে রাজশাহীর সাঁওতাল, ওরাওঁসহ আদিবাসী সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে।

রাজশাহী একটি পুরাতন এবং ইতিহাস-সমৃদ্ধ জেলা। বাংলার নবাবী আমলে ১৭০০-১৭২৫ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলী খাঁন গোটা বাংলাদেশকে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য তেরটি চাকলায় বিভক্ত করেছিলেন। যার মধ্যে 'চাকলা রাজশাহী' নামে একটি বৃহৎ ও বিস্তৃত এলাকা নির্ধারিত হয়। পদ্মা নদীর দক্ষিণাঞ্চল, নদীয়া, যশোর ও বর্তমান বীরভূম এবং পদ্মার উত্তরাঞ্চল নিয়ে রাজশাহী চাকলা পরিচিত ছিল। রাজশাহী চাকলা ১৭১৪ সালে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁন নাটোরের রামজীবনের নিকট বন্দোবস্ত প্রদান করেন। ১৭৩০ সালে রাজা রামজীবন মারা গেলে তার দত্তক পুত্র রামকান্ত রাজা হন । কিন্তু ১৭৫১ সালে রামকান্তের মৃত্যুর পরে তার স্ত্রী ভবানী দেবী, 'রাণী ভবানী' নামে উত্তরাধিকার লাভ করেন। ১৭৮৬ সালে রাজশাহীর আয়তন ছিল প্রায় ১৩ হাজার বর্গ মাইল। অর্থাৎ পাবনা, বগুড়া, রংপুর, মালদহ ও দিনাজপুরের অনেক অংশ রাজশাহীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই বিশাল এলাকায় রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়ার পর রাজশাহীর সীমানা থেকে মুর্শিদাবাদ, নদীয়াকে যশোরের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আইন

www.pathagar.com

শৃংখলা রক্ষার প্রশ্নে সীমানা আরও সংকুচিত করা হয় ১৮১৩ সালে। রাজশাহী হতে চাঁপাই, রহনপুর, পুর্ণিয়া ও দিনাজপুরের অংশ নিয়ে মালদহ জেলা গঠিত হয়। ১৮২১ সালে আদমদীঘি, শেরপুর ও বগুড়াকে রাজশাহী থেকে পৃথক করে নিয়ে, সাথে রংপুর ও দিনাজপুরের ১২ টি থানা নিয়ে গঠন করা হয় বগুড়া জেলা। ১৮৩২ সালে খেতুপাড়া, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর ও মথুরা নিয়ে পাবনা জেলা গঠিত হয়।

১৮২৫ সাল পর্যন্ত নাটোর ছিল রাজশাহীর সদর দপ্তর। ১৮২৫ সালে রামপুর - বোয়ালিয়ায় (বর্তমান রাজশাহী শহর) রাজশাহীর প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রথমে অফিস আদালত গড়ে ওঠে বোয়ালিয়ার নিকট শ্রীরামপুর নামক স্থানে। ১৮৫০ সালে পদ্মা নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গনে রাজশাহীর অফিস-গৃহ নদীবক্ষে নিমজ্জিত হয়। পরে বুলনপুর নামক স্থানে অফিস আদালত স্থাপিত হয় - যা বর্তমানেও বিদ্যমান। ১৮৮৬ সালে জেলা বোর্ড গঠিত হয় এবং জেলা প্রশাসনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থাকে রাজশাহী জেলা ও শহর। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় রাজশাহী সদর, নওগাঁ, নাটোর মহকুমা ও নবাবগঞ্জ নিয়ে গঠিত হয় রাজশাহী জেলা। তখন এটির আয়তন ছিল ৯৪৫৬ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির আওতায় নওগাঁ, নাটোর, নবাবগঞ্জ আলাদা জেলা হিসেবে পৃথক হয়ে যায়। রাজশাহী জেলার সীমানা এসে দাঁড়ায় বর্তমান ২৪৬৩ বর্গ কিলো মিটারে। এই জেলার দক্ষিণে ভারত, পশ্চিমে নবাবগঞ্জ, পূর্বে নাটোর এবং উত্তরে নওগাঁ জেলা। গবেষণার শিরোনামে ব্যবহৃত 'রাজশাহী জেলা' বলতে এই বর্তমান রাজশাহী জেলাকে বোঝানো হয়েছে - যার আয়তন ২৪৬৩ বর্গ কিলো মিটার। বাঘা, বাগমারা, বোয়ালিয়া, চারঘাট, দুর্গাপুর, গোদাগাড়ী, পবা, তানোর, পুঠিয়া, মোহনপুর, মতিহার, রাজপাড়া, শাহ মখদুম থানাসমূহকে নিয়ে বর্তমান রাজশাহী জেলা গঠিত।

রাজশাহী শহর ও এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক খ্যাতির সাথে জড়িয়ে আছে খ্রিস্টান বিশ্ব তথা ইউরোপীয়দের নাম। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আগমনকারী ওলন্দাজ বণিকরা রেশম শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রাজশাহীতে এসেছিলেন। তারা পদ্মার উত্তর তীরে রামপুর-বোয়ালিয়ায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গড়ে তোলে প্রথম বাণিজ্য কুঠি। তারা তাদের বসতি স্থাপন করে রাজশাহী শহরের গোড়াপত্তন করেন। তাদের পরে আসেন ইংরেজ বণিকগণ। তারাও বাণিজ্যিক কুঠি এবং রেশম ও নীল কারখানা প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। তাদের সাথে আসেন খ্রিস্টান ধর্মযাজক ও পাদ্রীরা। এভাবেই রাজশাহীতে খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদের কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেওয়ার অবকাশ পায়। কালক্রমে তাদের কর্মকান্ড সীমিত হয়ে পড়ে রাজশাহীতে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে।

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এবং ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিস্টান সমাজের আগমনের ইতিহাস এবং বাংলাদেশে তাদের প্রাথমিক সময়ের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমন

১৪৯৮ সালে ভাস্কো দ্য গামা কর্তৃক প্রাচ্যের জলপথ আবিস্কার করার পরই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয়দের আগমন ঘটতে থাকে। ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে পর্তুগীজরা এদিকে বসবাস করতে থাকেন। বিজিত এ অঞ্চলে শাসন কার্য পরিচালনার জন্য ১৫০৯ সালে ভারতে প্রথম গভর্ণর হয়ে আসেন আল ফসনো দ্য আল বুকার্ক (১৫০৯-১৫১৫)। গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের পর তিনিই প্রথম ভারতভূমিতে ইউরোপীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সমস্ত বাণিজ্যিক কর্মের প্রচ্ছদপটে ছিল খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার। হিন্দু - মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে থাকেন তিনি এবং তাঁর সহকারীরা। তাঁর নেতৃত্বে পর্তুগীজদের প্রচারের মাধ্যমে ভারত তথা বাংলার এ অঞ্চলে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও পরিচিতি লাভ করে।

আল বুর্কাকের পর পর্তুগীজরা ভারতের পশ্চিম উপকুলে বোম্বাই, গোয়া, দমন, দিউ, বেসিন, সলসেট, মাদ্রাজের নিকটবর্তী সানটোম, নাগপট্টম, উড়িষ্যার উপকুলে বালেশ্বর খড়গপুর, বাংলার হুগলী, শ্রীরামপুর, বান্ডেলা, সপ্তগ্রাম, সন্দীপ, চট্রগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্য কেন্দ্র নির্মাণ করেন[১]। স্থানীয় বাসিন্দাদের পর্তুগীজরা জোর করে খ্রিস্টান বানাত। ধর্ম প্রচারে জোর জবরদস্তি করার কারণেই হুগলী থেকে মোঘল সম্রাট শাহজাহানের আদেশে পর্তুগীজরা বিতাড়িত হয় (১৬৩২ সাল)[২]। ঢাকার অদূরে পর্তুগীজ পাদ্রীরা এভাবে ২০ হাজার নিম্নবর্ণের হিন্দুকে খ্রিস্টান বানিয়েছিল। ঢাকার আর্মানিটোলায় তার নিদর্শন আজও আছে। ঢাকায় রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মে গণ-দীক্ষিত করার ঐ ঘটনাটি ঘটেছিল ১৭৪৩ সালে দোম আন্তনিও রোজারিও নামক খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত একজন বাঙালী পাদ্রী কর্তৃক[৩]। এভাবে পূর্ব বাংলায় নিম্নশ্রেণীর অনেক লোক পর্তুগীজদের প্ররোচনায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। বহু পর্তুগীজ এ দেশীয় মহিলাদের বিবাহ করেছিলেন। ফলে এ অঞ্চলে একটি বৃহৎ বাঙালী খ্রিস্টান সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে ডাচ ও ইংরেজ কোম্পানীর সাথে শক্তির জোরে টিকতে না পেরে পর্তুগীজরা তাদের কর্মকান্ড গুটিয়ে নেয়। তবে তারা বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা রেখে যান।

www.pathagar.com

১৬০০ সালে লন্ডনের ৮০ জন বণিক মিলে গড়ে তোলেন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। উদ্দেশ্য, প্রাচ্যের অফুরন্ত সম্পদের সুফল ভোগ করা। রাণী এলিজাবেথের অনুমোদন নিয়ে কোম্পানী ১৬০১ সালে প্রাচ্যে আসে। প্রথম কয়েক বছর তারা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্রসমুহে বাণিজ্য -কারবার পরিচালনা করে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাদের সাথে ডাচ বণিকদের সংঘর্ষ বাঁধে। কারণ, সে সময় মশলার দ্বীপপুঞ্জে ডাচরাই ছিল শক্তিশালী অবস্থানে। বাধ্য হয়ে ১৬০৮ সালে কোম্পানী ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তৎকালীন ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস্ এর পত্র নিয়ে কোম্পানীর প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। পর্তুগীজ বণিকরাই তখনকার ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। ফলে তাদের বাধার কারণে ভারতেও ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যাধিকার লাভে বিলম্ব ঘটে। পর্তুগীজদের সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষও হয় বেশ কয়েকটি এবং সে সকল সংঘর্ষে ইংরেজদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬১৮ সালের মধ্যে ভারতের বেশ কয়েকটি স্থানে ইংরেজ বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি পাওয়া যায়। ১৬৬১ সাল নাগাদ মাদ্রাজ, বোম্বাইসহ গুরূত্বপূর্ণ স্থানসমূহে ইংরেজ বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয় এবং ভারতের বাণিজ্যে কোম্পানী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হবার পর ইংরেজ কোম্পানী ধর্মীয় ও অন্যান্য ব্যাপারেও মনোযোগ দেয়। ভারতে নিয়োজিত ইংরেজ কর্মচারীদের জন্য ১৬৫৮ সালে প্রথমবারের মত একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক নিয়োগ করা হয়। ১০ বছর পর ১৬৬৮ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২ জন করা হয়। পরবর্তীতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ১৬৯৮ সালের সনদ অনুযায়ী ভারতে খ্রিস্টান যাজকদের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়। ধর্ম যাজকদের কাছে সে সময় ব্যাপকভাবে মিশনারী কাজ আশা করা হয়নি। কোম্পানী তখন চেয়েছিল, তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যাতে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়[৪]। ১৭৭৮ সালে বাংলায় বেশী সংখ্যক ধর্ম যাজক নিয়োগ দেয়া শুরু হয়। যাজকদের দায়িত্ব ছিল ধর্মগ্রন্থ পাঠ, প্রার্থনা পরিচালনা, বিবাহ-সাদিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা। কিন্তু বাংলা কিংবা ভারতের স্থানীয় ধর্মীয় বিশ্বাসের মাঝে গুটিকতক খ্রিস্টান কর্মচারীকে ধর্মযাজকরা খ্রিস্টান ধর্মে আন্তরিকভাবে মনোনিবেশ করাতে ব্যর্থ হয়। ফলে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাঝে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মিশনারী কর্মকান্ডের চিন্তাধারা জোরালো হয়।

ডেনমার্কের রাজা ৪র্থ ফ্রেডারিকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৭০৫ সালে গঠিত হয় ধর্মীয় সংস্থা 'রয়েল ডেনিশ মিশন'। তারও আগে ১৬৭৬ সালে দিনেমাররা ভারতে বাণিজ্য করতে আসে এবং ১৬৭৬ সালেই তারা শ্রীরামপুরে কুঠি নির্মাণ করেছিল।

www.pathagar.com

দিনেমাররা খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতীয় ভাষায় বাইবেল প্রচার করার জন্য পুস্তক মুদ্রণ করত। অবশ্য ১৮৪৫ সালে ব্রিটিশ কোম্পানীর কাছে তারা সমস্ত বাণিজ্য কুঠি, প্রাসাদ এবং উপনিবেশগুলি বিক্রয় করে চলে যায়।

১৭০৫ সালে রাজা ৪র্থ ফ্রেডারিকের প্রতিষ্ঠিত রয়েল ডেনিশ মিশন হতে রেভারেন্ড জন জাকারিয়া নামক একজন মিশনারী প্রথম প্রটেস্ট্যান্ট হিসেবে দক্ষিণ ভারতে আসেন। তিনি ইংল্যান্ডের খ্রিস্টান সংস্থা The Society for Promoting Chistian Knowledge (SPCK) কর্তৃক আর্থিক সাহায্যও লাভ করেন। ভারতের ট্রাঙ্গকুবার নামক ডেনিশ রেসিডেন্ট এলাকায় লুথারেন মিশনারীদের এই কর্মকান্ডই ছিল উপমহাদেশে প্রথম প্রটেষ্ট্যান্ট মিশনারী পদক্ষেপ[৫]। ১৭৫৮ সালে ফ্রান্সের সৈন্যদের কাছে জন জাকারিয়ার মিশন পরাজিত হয়ে ভেঙ্গে গেলে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানীর গভর্ণর লর্ড ক্লাইভ তাকে আমন্ত্রণ জানান এবং ক্লাইভের ব্যক্তিগত সমর্থনেই তিনি বাংলায় খ্রিস্টান মিশনারী কর্মতৎপরতা চালিয়ে যান। জন জাকারিয়া ১৭৭০ সালে কলকাতায় তার ব্যক্তিগত অর্থে একটি চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন[৬]।

তবে কলকাতায় প্রথম চার্চ নির্মিত হয় ১৭০৯ সালে ইংরেজ নাবিক ও বসবাসরত খ্রিস্টান অধিবাসী কর্তৃক। কারণ প্রত্যেক ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে থাকতেন এক বা একাধিক ধর্ম যাজক। তারা কুঠি বা দূর্গ নির্মাণের সঙ্গে একটি গীর্জা ও সমাধি স্থান নির্মাণ করতেন[৭]।

বাংলায় মিশনারীগণ

১৭৯২ সালের ২ অক্টোবর লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি (Baptist Missionary Society- BMS)। এই সংস্থার প্রথম সম্পাদক হন এন্ড্রু ফুলার। সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রথম মিশনারী হয়ে উইলিয়াম কেরী ও উইলিয়াম থমাস সামান্য বেতনে সপরিবারে কলকাতায় আসেন। বেতন অল্প হওয়ায় তারা চরম আর্থিক সংকটে পড়েন। তবু তারা মনোবল হারাননি। বরং সুন্দরবন এলাকায় কিছু পতিত জমি চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহের সিদ্ধান্ত নেন। তাদের এই ঘোর দুর্দিনে সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসেন *'ইনডিগো ফ্যাক্টরী'* নামক ইংরেজ একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি উড্‌নী। তিনি উইলিয়াম কেরীকে ফ্যাক্টরীর সুপারেনটেনডেন্ট পদ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। অপর মিশনারী উইলিয়াম থমাসকেও তিনি মহিপালদিঘিতে অনুরূপ একটি কোম্পানীতে চাকুরীর প্রস্তাব দেন। আপাতত খেয়ে পরে বেঁচে থাকা ও কারখানার কর্মচারীদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তারা এই পদ গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

উইলিয়াম কেরী ফ্যাক্টরীতে কাজ নিলেও তার মিশনারী দায়িত্ব বহাল থাকে। প্রতি বছর তিনি তার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান (Baptist Missionary Society) কে তার কর্মকান্ডের প্রতিবেদন পাঠাতে থাকেন এবং এই প্রতিবেদনসমূহ সংস্থার বার্ষিক অধিবেশনে পেশ করা হয়। উইলিয়াম কেরীর প্রতিবেদন লন্ডনে প্রকাশ হবার পর অন্যান্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও ভারতে ধর্ম প্রচারে অনুপ্রাণীত হয়ে বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তোলে। যেমন, ১৭৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় লন্ডন মিশনারী সোসাইটি (LMS), দি চার্চ মিশনারী সোসাইটি ফর আফ্রিকা এন্ড দি ইষ্ট (CMS), ওয়েষ্ট ইন্ডিজের দ্বীপরাষ্ট্রসমূহে মিশনারী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৮১৪ সালে গড়ে ওঠে ওয়েজল্যান মেথোডিস্ট মিশনারী সোসাইটি (Wesleyan Metheodist Missionary Society -WMMS), ১৭৯৬ সালে স্কটল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় স্কটিশ মিশনারী সোসাইটি (The Scotish Missionary Society), অবশ্য পরে এই সংস্থার নাম দেয়া হয় এডিনবরা মিশনারী সোসাইটি (Edinburgh Missionary Society - EMS), এই সংস্থা রাশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায় তার কার্যক্রম পরিচালনা করে।

একই সময়ে ইংল্যান্ডের বাইরে মিশনারী সংস্থা গড়ে ওঠে নেদারল্যান্ডে। ১৭৯৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নেদারল্যান্ড মিশনারী সোসাইটি (The Netherlands Missionary Society - NMS)। ইংল্যান্ডের কিছু উৎসাহী খ্রিস্টান মিলে গড়ে তোলেন রিলিজিয়াস ট্রাক্ট সোসাইটি (The Religious Tract Society -RTS)। ১৮০৪ সালে এমনি আরেকটি সংস্থা গড়ে ওঠে, নাম ব্রিটিশ এ্যন্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি (British and Foreign Bible Society)[৪]।

উইলিয়াম কেরী ও উইলিয়াম থমাস দুজনই প্রথমে নিজেদের নিয়োজিত করেন বাংলা ভাষা শেখার কাজে, যাতে তারা স্থানীয় ভাষায় যীশু ও তাঁর শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ তারা বাইবেল, খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কিত পুস্তিকা ইত্যাদি অনুবাদ করে বাংলা ভাষা-ভাষীদের মাঝে বিতরণ করতে থাকেন এবং তৃতীয়তঃ ব্যাপকভাবে মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা ও সেগুলি পরিচালনা করেন। তাদের এই কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও বাংলায় শিক্ষা বিস্তারে মিশনারীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

বাংলা ভাষা শেখার পর উইলিয়াম কেরী অনুবাদের কাজে হাত দেন। মুন্সী রাম রাম বসু নামক স্থানীয় একজন হিন্দু ভদ্রলোক কেরীকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। কারখানার শ্রমিক, কলকাতার মানিকতলায় অবস্থিত উইলিয়াম কেরীর বাসভবনের

www.pathagar.com

পার্শ্ববর্তী হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবেশীদের মাঝে কেরী কাজ করে যেতে থাকেন। ১৭৯৪ সালে উইলিয়াম কেরী মালদহে তার প্রথম মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় স্বল্প সংখ্যক বালককে তিনি পঠন, লিখন, গণিত ও স্থানীয় হিসাব পদ্ধতি শেখানোর পাশাপাশি খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাদান করেন[৯]। বাংলায় প্রকাশনা শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীদের অবদানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

১৭৯৮ সালে কলকাতায় একটি কাঠের প্রেস বিক্রির বিজ্ঞাপন দেখে উইলিয়াম কেরী সেটি ক্রয় করেন। এতে অর্থ যোগান দেন ইন্ডিগো ফ্যাক্টরীর (Indigo Factory) বাণিজ্যিক প্রতিনিধি উডনী। পরে উইলিয়াম কেরী প্রেসটিকে নিয়ে শ্রীরামপুর আসেন। ইতোমধ্যে বি.এম.এস. (BMS) আরো ৪ জন মিশনারীকে বাংলায় পাঠায়। তাদের মধ্যে তিন জন হলেন ব্রাডসন গ্র্যান্ট, জে. মার্শম্যান, এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড [১০]। তারা সবাই মিলে পরামর্শ ক্রমেই ডেনিশ ব্যবসায়ীদের পত্তনকৃত শহর শ্রীরামপুরে আসেন। প্রেসের দায়িত্ব দেয়া হয় উইলিয়াম ওয়ার্ডের উপর। পঞ্চানন নামক স্থানীয় একজন কামার ও তারই অপর একজন আত্মীয় মনোহরকে প্রেসে চাকুরি দেয়া হয়। এদের সহযোগিতায় উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রেসে বাংলা টাইপ বানাতে সক্ষম হন। অল্প দিনের মধ্যেই উইলিয়াম কেরী তার প্রথম পদক্ষেপে ব্যাপক সফলতা লাভ করেন। ১৮১৩ সালে লন্ডনের বি.এম.এস. (BMS) কে লেখা এক প্রতিবেদনে উইলিয়াম কেরী উল্লেখ করেন যে, ভারতে এখন তাদের আটটি প্রেস কাজ করে[১১]।

১৮০০ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী প্রতিষ্ঠা করেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। কলেজ প্রতিষ্ঠার পরপরই ১৮০১ সালে উইলিয়াম কেরী কলেজের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। উইলিয়াম মার্শম্যানও যোগদান করেন শিক্ষক হিসেবে।

১৮১৮ সালে বি.এম.এস (Baptist Missionary Society) কলকাতায় একটি কেন্দ্র খোলেন এবং এসময় সেখানেও একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করে। ১৮১৯ সালে এল.এম.এস (London Missionary Society) ও কলকাতায় প্রেস স্থাপন করে। সেটির দায়িত্বে ছিলেন জর্জ গোজারলী (G. Gogerly)। অবশ্য ১৮২৫ সালে এই প্রেসটিকে বিক্রি করে দেয়া হয়। চার্চ মিশনারী সোসাইটি (The Church Missionary Socity) ১৮২২ সালে সেখানে আরেকটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করে। সেটি ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

www.pathagar.com

এ সমস্ত প্রেসের মাধ্যমে বাইবেলের অনুবাদ এবং অন্যান্য পুস্তিকা বাংলা ভাষাভাষীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়, যাতে তারা নিজেদের ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে পারে[১২]।

মিশনারীরা প্রধান দুটি নীতির ভিত্তিতে এই অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন করতেন।

প্রথমতঃ বাইবেলের অনুবাদ ছাপানো এবং দ্বিতীয়তঃ ছোট-খাট ধর্মীয় পুস্তিকা প্রকাশ। উইলিয়াম কেরী প্রথম বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্ট অনুবাদ করেন ১৭৯৪ সালে এবং এটি ১৮০১ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮০৪ সালে মিশনারীরা লন্ডনে তাদের সোসাইটিকে লেখা রির্পোটে উল্লেখ করেন যে, কমপক্ষে ৭ টি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ হওয়া দরকার। তারা অনুবাদ কর্মের বিস্তারিত পরিকল্পনার কথাও জানান। অত:পর বি.এফ.বি.এস.(The British and Foreign Bible Society) উডনীর কাছে প্রেরিত এক পত্রে উইলিয়াম কেরী, উইলিয়াম মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ডসহ ৫ সদস্য বিশিষ্ট কলকাতায় একটি কমিটি গঠন করার জন্য বলা হয়। সে অনুযায়ী কমিটি গঠিত হয় এবং বাইবেল অনুবাদ ও প্রকাশের জন্য শ্রীরামপুরের মিশনারীরা সোসাইটি থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেন। তারা ১৮১৩ সালে লন্ডনে BMS কে এক রিপোর্টে জানান যে, প্রাচ্যের ২৪ টি ভাষায় বাইবেল অনূদিত হয়েছে অথবা অনুবাদের আওতায় আনা হয়েছে। মিশনারীরা মোট ৪০ টি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছিল। তার মধ্যে উইলিয়াম কেরী একাই বাংলা, হিন্দী, মারাঠি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। উইলিয়াম মার্শম্যান বিশেষভাবে চীনা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন[১৩]।

বাইবেলের খন্ডগুলি ছিল বৃহৎ আকারের এবং এগুলি বিতরণও ছিল ব্যয় সাপেক্ষ। ফলে তারা ধর্মীয় ছোট খাট পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরন করতে থাকেন। ১৮২৩ সাল পর্যন্ত তারা ইংল্যান্ড হতে প্রকাশিত পুস্তিকার সরবরাহ পেতেন এবং স্থানীয়ভাবে সেগুলি অনুবাদ করে ছাপতেন। স্থানীয়ভাবে যাতে ব্যাপকভাবে ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করা যায় সে উদ্দেশ্যে ১৮২৩ সালে BMS, LMS, CMS প্রভৃতি সংস্থা মিলে যৌথভাবে কলকাতায় গড়ে তোলেন রিলিজিয়াস ট্রাক্ট সোসাইটি (A Religious Tract Society)। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় লন্ডনের Religious Tract Society 'র একটি শাখা হিসেবে। ১৮২৭ সালে এটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় The Calcutta Cristian Tract and Book Society। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এই সোসাইটির সাথে যৌথভাবে কাজ না করলেও তারা লন্ডনের সোসাইটির প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং লন্ডন থেকে প্রদত্ত কাগজ ও তাদের প্রেরিত আর্থিক সহায়তায় লন্ডনে প্রকাশিত পুস্তিকার অনুবাদ প্রকাশ করতেন।

www.pathagar.com

প্রথম বাংলা পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর থেকে। রাম রাম বসু রচিত The Gospel Messenger বা 'বাহকের ধর্মীয় পুস্তক'। ১৮০১ সালে তার আরেকটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, নাম- 'জ্ঞানোদয়'। এই পুস্তিকায় ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন বিষয়কে কটাক্ষ করা হয়েছে। এমনকি নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে বড় মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে[১৪]। উইলিয়াম মার্শম্যান লিখেন 'পার্থক্য' (Defference)। এতে লেখক মার্শম্যান কর্তৃক হিন্দু দেবতা কৃষ্ণকে যীশুর সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে তুলোধুনো করা হয়েছে। ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয় 'একজন পাদ্রী ও একজন ব্রাহ্মণের কথোপকথন', 'একজন দারোগা ও একজন মালির কথোপকথন', 'একজন পন্ডিত ও একজন সরকারের কথোপকথন', 'একজন মা ও একজন কন্যার কথোপকথন'। এমনি অসংখ্য পুস্তিকা শ্রীরামপুর মিশন, কলকাতা মিশন সোসাইটি, কলকাতা ক্রিষ্টিয়ান ট্রাক্ট এন্ড বুকস্ সোসাইটি প্রভৃতি সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়[১৫]।

তবে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিল পর্তুগীজ মিশনারীরা । পর্তুগীজ পাদরী মনোএল দ্য আস সুম্পসাঁও এবং বাঙ্গালী খ্রিস্টান *দোম আন্তোনিও দো রোজারিও* রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মনোএল রচনা করেন বাংলা ব্যকরণ, যা পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ সালে। গ্রন্থটির পর্তুগীজ নাম Vocabulario em Indioma Bengalla e Portuguez, যার বাংলা অর্থ দাড়ায় - 'পর্তুগীজ বাংলা ভাষার অভিধান ও ব্যকরণ'। তার আর একটি গ্রন্থ- 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বা অর্থবেদ। পর্তুগীজ ভাষায় এটিও প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ সালে লিসবন থেকে।

দোম আন্তনিও দো রোজারিও একজন বাঙালী। তিনি অতি অল্প বয়সে খ্রিস্টান পাদ্রীদের সংস্পর্শে এসে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার নামটিও পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের দেয়া । তার লিখিত পুস্তিকা 'ব্রাহ্মণ -রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। এই পুস্তিকায় তিনি একজন কল্পিত ব্রাহ্মণ ও খ্রিস্টান আচার্য্যের মধ্যে বিতর্কের মাধ্যমে নিজের ধর্মমতের প্রচার করেন। কোন কোন স্থানে তিনি অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুদের আচার-আচরনের কঠোর সমালোচনা করেছেন[১৬] ।

ব্যাপকভাবে এবং স্বীকৃত পন্থায় বাংলায় মিশনারী কর্মকান্ড শুরু হয় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ১৮১৩ সালের সনদ আইন প্রবর্তনের ফলে। ইতিপূর্বেকার মিশনারী কর্মকান্ডের কারণে এক দিকে যেমন তারা ব্যাপকভাবে উৎসাহিত হয়েছেন, অন্যদিকে স্থানীয় অনেক সুধীবৃন্দের কাছ থেকে প্রতিবাদেরও মুখোমুখী হয়েছেন

www.pathagar.com

স্থানীয় শাসকরা ব্রিটিশ রাজের এই ধর্মীয় পলিসিকে ভালো চোখে দেখেন নাই। ১৮১৩ সালের সনদ আইন প্রবর্তনকালে দুটি বিষয় জোরালোভাবে দেখা দেয় ঃ

এক. মিশনারীদের ভারতে কাজ করার অনুমতি দেয়া হবে কি না ।

দুই. কোম্পানী ভারতের শিক্ষার ভার গ্রহণ করবে কি না ।

মিশনারী কর্মকান্ডের সমর্থনে সে সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রায় ৮৫০ টি আবেদন পত্র জমা পড়ে[১৭]। অবশেষে ১৮১৩ সালের সনদ গৃহীত হয় এবং তাতে উল্লেখ করা হয় যে, কলকাতায় একজন প্রধান বিশপ ও অন্যান্য তিন জন সহকারী বিশপ নিযুক্ত হবেন। অন্য আরেকটি ধারায় ছিল 'ভারতের শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হবে'[১৮]। এই সনদ আইনের ফলে বাংলার শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রচারাভিযান ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮১৮ সালের মে মাস নাগাদ ৩৬ টি মিশনারী স্কুল চালু হয় এবং এ সমস্ত স্কুলে ২৬৯৫ জন বালক অধ্যয়ন করে। ১৮১৩ সালে কলকাতায় প্রথম বিশপ হয়ে আসেন থমাস ফাঁসোয়া মিডলটন। তিনি ১৮২০ সালে শিবপুরে প্রতিষ্ঠা করেন বিশব কলেজ। ১৮১৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি ফার্সী স্কুল এবং কয়েকটি বাংলা স্কুল। ১৮২৩ সাল নাগাদ এই সংখ্যাটি দাঁড়ায় ২৩ টিতে। মুর্শিদাবাদে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৮১৭ সালে। ১৮২৩ সালের মধ্যেই ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, কটোয়া, দিনাজপুর, বীরভুম, যশোরে স্কুল প্রতিষ্টা করা হয়। মিশনারী স্কুলসমূহে বিশেষভাবে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা দান করা হত।

বাংলায় খ্রিস্টান মিশনারী কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রথম অবধি শ্রীরামপুর কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। উইলিয়াম কেরী ও ওয়ার্ড শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করে বাংলার সর্বত্র খ্রিস্টন ধর্ম প্রচারের বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য স্থানে উপকেন্দ্র নির্মিত হতে থাকে। ১৮০৪ সালে দিনাজপুরে, ১৮০৭ সালে যশোরে, ১৮০৮ সালে মালদহে, ১৮১২ সালে চট্টগ্রামে, ১৯১৬ সালে ঢাকায় মিশনারী উপকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উপকেন্দ্রগুলিতে একজন ইউরোপীয় মিশনারী ও এক বা একাধিক ভারতীয় সহকারী নিযুক্ত হতেন। তাদের কাজ ছিল জনগণের মাঝে ধর্মীয় পুস্তিকা বিতরন, অন্যান্য খ্রিস্টান সাহিত্য বিতরণ এবং যেখানে সম্ভব স্কুল প্রতিষ্ঠা করা[১৯]।

১৭৯৩-১৮২৩ সালের মধ্যে মিশনারীদের বড় কৃতিত্বের একটি হল, সম্পূর্ণ নতুন টেক্সটবুক প্রবর্তন, যা 'নব শিক্ষা' নামে পরিচিত। পঠন, লিখন, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে তারা পদ্ধতিগত শিক্ষা প্রবর্তন করেন। ১৮১৬ সালে শ্রীরামপুর থেকে বাংলা ভাষার উপর একটি সিরিজ প্রকাশ করা হয় । ১৮১৮ সালে 'দিক দর্শন' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয় এবং ১৮২১ সাল পর্যন্ত এটি প্রকাশ হতে থাকে।

www.pathagar.com

১৮১৮ সালেই প্রথম বাংলা ভাষার সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পন' প্রকাশ শুরু হয়। এই পত্রিকা ১৮৪১ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। এ সকল প্রকাশনা খ্রিস্টান মিশনারী উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল[২০]।

বাংলায় শিক্ষা বিস্তারে মিশনারীদের স্ত্রীগণও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যার নাম উল্লেখ করা যায় তিনি হলেন মিস মেরী কুক। তিনি পেশাগত জীবনে ছিলেন একজন শিক্ষিকা। তার স্বামী আইজ্যাক উইলসন। মিস কুক ১৮২১ সালে বাংলায় আসেন। তার প্রচেষ্ঠায় ১৮২৩ সাল নাগাদ ১৫ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩০০ জন। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে তার বিরাট অবদান রয়েছে[২১]।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের শিক্ষা বিস্তারের পুরোভাগে ছিলেন খ্রিস্টধর্ম প্রচারক মিশনারীরা ও দেশীয় সুধীজন। উইলিয়াম কেরী খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য বাংলায় এসে বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। এটিই বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা। ১৮৩১ সালে রেফারেন্ড ডাফ নামক একজন স্কচ্ মিশনারী খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি কলেজ স্থাপন করেন। ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা, ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ১৭৯২ সালে ডেভিড হেয়ার কলকাতায় একটি স্কুল প্রতিষ্টা করেন, যার পরবর্তীতে নাম হয় হেয়ার স্কুল। এ সকল প্রতিষ্ঠান মিশনারীদের উদ্যোগে ইংরেজ সরকারের পৃষ্টপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপমহাদেশে মিশনারীদের সকল কর্ম-তৎপরতার মূলে যে প্রচ্ছন্ন ও পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ছিল, তা হল যীশু খ্রিস্টের বাণী প্রচার করা, খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি করা। মিশনারীরা যে সমস্ত স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তাতে সাধারণ শিক্ষা, গণিত, স্থানীয় হিসাব পদ্ধতি শেখানোর পাশাপাশি খ্রিস্ট ধর্ম পড়ানো হত। ১৮১৬ সালে লন্ডন মিশনারী সোসাইটিকে প্রদত্ত এক প্রতিবেদনে বাংলায় ব্যপকভাবে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাদান ও তাদের কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়[২২]। উইলিয়াম কেরী ও উইলিয়াম থমাস ১৭৯৩-১৮০২ সাল পর্যন্ত যে প্রচারণা চালান তাতে ২৭ জন ধর্মান্তরিত হন।

১৮১৩ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ আইনে স্বীকৃতভাবে বাংলায় একজন প্রধান বিশপ ও তিনজন সহকারী বিশপ নিয়োগের পর ব্যাপকভাবে ধর্মান্তর কার্যক্রম চলতে থাকে। ১৮২২ সালে বাংলায় ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০৩ জনে। ১৮৩৩ সালে দেখা যায়, গোটা ভারতবর্ষে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৪০৬ জন -যার সিংহ ভাগই বাংলায়[২৩]।

www.pathagar.com

মিশনারীরা এদেশের সহজ সরল মানুষকে প্রভাবিত করে খ্রিস্টান বানিয়ে ছাড়ছে - এমন প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৮ সালের মহা বিদ্রোহের একটা কারণ ছিল, ভারতীয় হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্পর্শকাতর বিষয়গুলির উপর খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ইংরেজ সরকারের আঘাত। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতীয়দের এরূপ মনোভাব হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি সে বৎসরই ঘোষণা করেন যে, কারো ধর্মে যেন আঘাত করা না হয়। সে ঘোষণা দেশব্যাপী প্রচারও করা হয়েছিল। কিন্তু এর পরের বছর ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী বিবৃতি দেন ভারতে ব্যাপকভাবে ধর্মীয় প্রচারণা ও খ্রিস্টান সংখ্যা বৃদ্ধির সপক্ষে। তিনি বলেন, 'ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র সম্ভাব্য সকল উপায়ে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও সমৃদ্ধি সাধন করা শুধু আমাদের কর্তব্যই নয়, বরং এটা আমাদের স্বার্থে কল্যাণকরও'[২৪]।

তৎকালীন ভারত সচিব এদেশে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের বিষয়টিকে আরো গুরুত্বারোপ করে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'প্রতিটি নবদীক্ষিত খ্রিস্টান ঐক্যের এক একটি নয়াসূত্র, যা দ্বারা ভারতবর্ষ ও আমাদের দেশের মধ্যে অস্তিত্ব লাভ করে এবং এর দ্বারা আমাদের সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি পায়'[২৫]। অর্থাৎ এদেশে খ্রিস্ট ধর্মের প্রসার ও খ্রিস্টান জনশক্তি বৃদ্ধির পদক্ষেপটিকে ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিকভাবেই নিয়েছিলেন। ফলে সরকারী আনুকূল্য ও মিশনারীদের চেষ্টায় ভারতীয়দের একটি বিরাট সংখ্যক মানুষ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ১৮১৮ সালের আদম শুমারীতে দেখা যায়, গোটা ভারতে খ্রিস্টান সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।

ধর্মান্তরিতদের অধিকাংশই ছিল অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণের হিন্দু। বাদ বাকীরা সংখ্যালঘিষ্ট আদিবাসী। ১৯৩১ সালে খ্রিস্টান সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১ লাখ ৮৩ হাজার ৬৬ জন। অবশ্য এই সংখ্যার মধ্যে ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়রাও ছিল। ১৯৪১ সালে গোটা বাংলায় দেশীয় খ্রিস্টান লোক সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১১ হাজার ৪২৬ জন। ইংরেজ সরকার বিদায় নেবার কালে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশে) পড়েছিল প্রায় ৫০ হাজার খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী জনগণ[২৬]।

মিশনারীদের প্রচেষ্টায় খুব কম মুসলমানই খ্রিস্টান হয়েছেন। নদীয়া জেলার এক যুবক জমিরউদ্দীন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৮৭ সালে খ্রিস্টান হবার পর তাকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রথমে কলকাতায় ও পরে এলাহাবাদে পাঠানো হয়। এলাহাবাদ সেন্ট পলস্ ডিভিনিটি কলেজে তিনি কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন ও জন জমিরউদ্দীন নামে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তিনি পরে আবার ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সে সময় বিভিন্ন

www.pathagar.com

সমাবেশে তিনি এবং অন্যান্য আলেমগণ খ্রিস্টান মিশনারী বিরোধী বক্তব্য প্রদান করেন। মুন্সী জমিরউদ্দীনের বিষয়টি সে সময় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

মিশনারীদের কর্মকান্ডের প্রভাব পড়েছিল হিন্দু সমাজের উপর। বিশেষ করে ১৮৩০ সালে খ্রিস্টান মিশনারী আলেকজান্ডার ডাফ কর্তৃক স্কটিশ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে হিন্দুদের উপর এই কলেজের বিশেষ প্রভাব পড়ে । এসময়েই আলেকজান্ডার ডাফ কবি মধুসুদন দত্তকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন[২৭]।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, খ্রিস্টান মিশনারীরা যে উদ্দেশ্যে বাংলায় এসেছিল, বাণিজ্যের পাশাপাশি খ্রিস্টের বাণীর ব্যাপক প্রচার এবং খ্রিস্টান সমাজ প্রতিষ্ঠা, তা সার্থক হয়েছিল এবং তাদের প্রচেষ্ঠায় এ দেশের বিরাট এক জনগোষ্ঠী খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের অবসান হলে ইংরেজ সরকারী কর্মকর্তারা চলে যান কিন্তু ইতিমধ্যেই বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে যে ব্যাপক সংখ্যক খ্রিস্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল ও ধর্মযাজক শ্রেণী তৈরী হয়েছিল, তাদের তৎপরতা অব্যাহত থাকে। এমন কি ইংরেজ আমলের দু'শো বছরে যে পরিমাণ মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হয়েছিল; দেখা যায় যে, পাকিস্তান হওয়ার পর ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ২৫ বছরে তার চেয়ে অধিক সংখ্যক মানুষ খ্রিস্টান হয়েছে[২৮]। অর্থাৎ, সরকারী পৃষ্টপোষকতা না পেলেও ব্যপকভাবে মিশনারী তৎপরতা অব্যাহত ছিল এবং এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার মিশনারী কর্মকান্ডে বাধা প্রদান করেনি।

এর প্রমান পাওয়া যায়, ১৯৫৮ সালে কানাডা থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক রোমান ক্যাথলিক মিশনারী সংস্থার প্রকাশিত একটি প্রসপেকটাস থেকে। এ রিপোর্টে মুসলিম দেশগুলোতে খ্রিস্ট ধর্মের প্রসার, বিস্তার ও অগ্রগতির উল্লেখ করতে গিয়ে বিশেষভাবে পাকিস্তান সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পাকিস্তানে চার্চ নিজস্ব প্রচারধর্মী মিশনে বিরাট সফলতা অর্জন করেছে এবং শুধু মাত্র গত বছরেই (১৯৫৭ সাল) ৮ হাজার ব্যক্তিকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হয়েছে। পাকিস্থানের সর্বমোট জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লাখ। এর মধ্যে রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা ৮০ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮০২৬৩ তে উন্নীত হয়েছে[২৯]।

এরূপ আরেকটি প্রতিবেদন বেরিয়েছিল 'আর্ন্তজাতিক ক্যাথলিক আলমানাক, ১৯৫৮' তে। তাতে বলা হয়েছিল আরও বিস্তারিত ভাবে পাকিস্তানের মিশনারী কর্মকান্ড সম্পর্কে। ১৯৫৭ সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে তাতে । রির্পোটে পাকিস্তান সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেখানে পাদ্রী ও ধর্মীয় পদে

www.pathagar.com

আসীন লোকদের সংখ্যা ৩৩৭, গীর্জা ৮৭টি, ধর্মীয় কর্মী সংখ্যা ৭৮২, শিক্ষক ৩৭৭, ছাত্র ৬৩৪০, অন্যান্য সংস্থা ৭২ এবং রোমান ক্যাথলিক সংখ্যা ২৬৮৩২২ জন[৩০]।

ক্যাথলিক প্রসপেক্টাস ও আলমানাক অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৯৫৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত পাকিস্তানে ক্যাথলিক খ্রিস্টান ছিল ২৬৮৩২২ জন আর ১৯৫৮ সালের রির্পোট মতে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৮০২৬৩ জন । অর্থাৎ মাত্র ১ বছরে ক্যাথলিক খ্রিস্টান সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৯৪১ জনে। এই বৃদ্ধি অবশ্য ধর্মান্তর ও জন্মগত উভয় ভাবেই হয়েছে। এটা কেবলমাত্র রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা। প্রোটেষ্ট্যান্ট কিংবা অন্যান্য খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সংখ্যা এর বাইরে[৩১]।

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান ও ভারতে পাশ্চাত্য খ্রিস্টান দেশগুলি দুঃস্থ মানবতার সেবার নামে বিভিন্ন মিশনারী সংস্থাকে পাঠায়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও অনুরূপ মিশনারী প্রতিষ্ঠান কাজে নেমে পড়ে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান মূলতঃ অনুন্নত এবং অনগ্রসর এলাকাগুলিতে আস্তানা গড়ে তোলে। যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মগ, পাঙ্খোয়া, বম, টিপরা, ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারো, হাজং, রাজবংশী, কোচ, রাজশাহী তথা বরেন্দ্র অঞ্চলের সাঁওতাল, ওরাওঁ, রাজবংশী, সিলেট জেলার মনিপুরী, খাসিয়া, বরিশাল, খুলনা অঞ্চলের নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ শুরূ করে। ঐ সমস্থ এলাকায় মিশনারীরা দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে এবং পাশাপাশি গীর্জা স্থাপন করে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করে। মিশনারীদের সেবামূলক কাজ ও কর্ম তৎপরতার কারণে অনুন্নত এলাকার অশিক্ষিত ও অবহেলিত জনসাধারণের অজ্ঞতা ও আর্থিক অনটনের সুযোগ নিয়ে বহু লোককে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হয়[৩২]।

দেশ বিভক্তির পর পাকিস্তানে মুহাজির সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। বাস্তুভিটা, সহায়-সম্বল সর্বস্ব হারিয়ে লাখো লাখো মানুষ ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে পাকিস্তানের দু' অংশে আশ্রয় নেয়। পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়া এ সকল মুহাজির বিভিন্ন ক্যাম্পে মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকে। অবশ্য অর্ধ শতাব্দী পার হয়ে গেলেও আজও মুহাজির সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। আজও মুহাজির পরিবারগুলি দেশের বিভিন্ন শহরে বস্তি গড়ে তুলে চরম দারিদ্র ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করছে। পাকিস্তান সরকার তাৎক্ষণিকভাবে মুহাজির সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হলে, তাদের দুর্দিনে সহযোগিতার হাত নিয়ে এগিয়ে আসেন মিশনারীরা। আমেরিকা-কানাডাসহ খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলি থেকে খ্রিস্টান সংগঠন ও চার্চসমূহ পাকিস্তানে মিশনারী তৎপরতা জোরদার করে।

www.pathagar.com

অন্যান্য সময়ের মতই পাকিস্তান আমলেও মিশনারীদের কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে জনমত সোচ্চার ছিল। এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে মুসলিম কয়েকটি পত্র-পত্রিকা ও বেশ কয়েকজন মুসলমান নেতা। *জাহানে নও* পত্রিকার বাংলা ২৩/০৪/৭২ তারিখ সংখ্যার এক রির্পোট থেকে পাকিস্তান সরকারের খ্রিস্টান মিশনারীদের ব্যপারে মনোভাব জানা যায়। রিপোর্টটির সারমর্ম হলোঃ খ্রিস্টান মিশনারীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর পর্বে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব হামিদ রেজা জিলানী পাকিস্তান সরকারের অবস্থা স্পষ্ট করেন। তিনি শাসনতন্ত্রের বরাত দিয়ে বলেন, খ্রিস্টান মিশনারী কার্যকলাপ সরকার বন্ধ করতে পারেন না। কারণ, তা পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। তিনি আরও বলেন, যতদিন খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি না হবে ততদিন সরকার এদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না[৩৩]।

পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইন করে দেন। এ সমস্ত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালনার জন্য প্রণীত হয় 'দি ভলেন্টারী সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এজেন্সিজ(রেজিস্ট্রেশন এন্ড কন্ট্রোল) এ্যাক্ট ১৯৬১'। অর্থাৎ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অনুমতি ও প্রশ্রয়েই মিশনারী কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৬১ সালের এক হিসেবে দেখা যায়, পাকিস্তানের উভয় অংশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য ৪০ টি সংস্থা তৎপর ছিল[৩৪]।

এভাবে পাকিস্তানে মিশনারী কার্যক্রম অবাধে চলে এবং তাদের প্রভাবে বিরাট সংখ্যক মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হন। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে খ্রিস্টান সংখ্যা ছিল ১,০৬৫০৭ জন, ১৯৬১ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৪৮৯০৩ জনে[৩৫]।

মিশনারী কর্মকান্ডের সাথে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার প্রথম পরিচিতি ঘটে। সর্বপ্রথম খ্রিস্টান গীর্জা স্থাপিত হয়েছিল এদেশের দিনাজপুরেই এবং বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীরা সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে দিনাজপুর জেলায়। দিনাজপুরের আদিবাসী ও মুহাজির ক্যাম্পে তাদের তৎপরতা অত্যন্ত জোরাল।

দিনাজপুর জেলার পর রাজশাহী জেলায় মিশনারী তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। র াহী জেলায় খ্রিস্টান মিশনারীদের কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে আছে আদিবাসীদের না· াদিবাসীদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্যই এ অঞ্চলে মিশনারীদের আগমন ঘটে াজশাহী অঞ্চলে আদিবাসীদের আগমন ঘটে ঈশ্বরদী-আমনুরা রেলপথ নি ং ময়। সে সময় দলে দলে আদিবাসীরা আসতে থাকে এবং তারা শ্রমিক

www.pathagar.com

হিসেবে কাজ করে। নির্মাণ কাজ শেষ হলেও আদিবাসীরা এখানে থেকে যায় তখন এই এলাকাটি ছিল অরণ্যময়,এবং আদিবাসীরা এটাকে মনে করত তাদের স্বর্গভুমি[৩৬]। বর্তমানকালেও দেখা যায়, ঈশ্বরদী থেকে আমনুরা পর্যন্ত রেলপথ বরাবর দু'পাশের গ্রামগুলিতে আদিবাসীদের বসবাস। এই আদিবাসীদের মাঝেই মিশনারীরা প্রথম অবধি ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ফল স্বরূপ, এ অঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারীদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান রাজশাহী শহর- যার পূর্ববর্তী নাম ছিল রামপুর-বোয়ালিয়া। এখানে প্রথম খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্যোগ নেন প্রটেস্ট্যান্ট ইংলিশ প্রেসবিটারিয়ান চার্চ এর মিশনারীরা। এখানে ১৮৬২ সালে প্রথম প্রেসবিটারিয়ান মিশনারী হয়ে আসেন রেভারেন্ড বিহারী লাল সিং। তিনি ছিলেন একজন এ দেশীয় খ্রিস্টান মিশনারী। তিনি প্রথমে রাজশাহীতে একটি স্কুল ও একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কাজ শুরূ করেন। তারও আগে ১৮৩১ সালে রাজশাহীতে কর্মরত ছিল ইংলিশ প্রেসব্রিটারিয়ান চার্চ, সাওঁতাল মিশন (রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলায়), ইত্যাদি মিশনারী প্রতিষ্ঠানসমূহ[৩৭]। রাজশাহীতে প্রেসবিটারিয়ান গীর্জা প্রথম স্থাপন করেন এক ইংরেজ নীলকর সাহেব। পরে নীলকুঠির সাহেব গীর্জাটি প্রেসবিটারিয়ান মিশনকে দান করেন। ১৮৭৭ সালে রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রিস্টিয়ান মিশন হাসপাতাল। ১৯১৬ সালের রাজশাহী গেজেটিয়ারে এল. এস. এস. ও ম্যানলী লিখেছেন, সে সময় রাজশাহীতে দেশী খ্রিস্টান সংখ্যা ছিল মাত্র ৩২৩ জন (*এবনে গোলাম সামাদ, রাজশাহীর ইতিবৃত্ত)*।

রাজশাহীতে ইংরেজ প্রেসবিটারিয়ান মিশন আদিবাসী সাঁওতালদের মাঝে কাজ শুরু করে ১৯৪৯ সালে। ইংরেজ মিশনারী রেভারেন্ড এ জি ম্যাকলাউড ও রেভারেন্ড ব্রায়ান ডসন এবং বাঙালী পাদ্রী রেভারেন্ড প্রিয় কুমার বারই প্রথমে কাজ শুরু করেন। তারা নাটোরের বেলঘরিয়া গ্রামে সাঁওতালদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। সে সময় বগুড়ার খঞ্জনপুরে আমেরিকান চার্চেস অব গড খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ছিল। লুথারান মিশনারীরা কর্মরত ছিলেন চাঁপাই নবাবগঞ্জ, আমনুরা এলাকায় এবং রাজশাহী সদর মহকুমা, নাটোর ও নওগাঁ মহকুমায় প্রেসবিটারিয়ান মিশনারীরা ধর্ম প্রচার করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন[৩৮]।

রাজশাহীর আদিবাসী

রাজশাহী অঞ্চলের বর্তমান জনসমষ্টিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হ'ল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান, অপরটি হিন্দু এবং তৃতীয়টি হলো আদিবাসী। খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচারণার কারণে ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং হচ্ছে মূলত

www.pathagar.com

আদিবাসীরা। মুসলমান-হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রিস্টান হওয়ার প্রবণতা খুবই কম। মুসলমানদের মধ্যে খুবই বিরল। অবশ্য নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রিস্টান হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। তবে ব্যাপকভাবে আদিবাসীরাই ধর্মান্তরিত হচ্ছে। রাজশাহী জেলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, ওরাওঁ, পাহাড়িয়া, মাহালী সম্প্রদায়ের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

'আদিবাসী' শব্দের অর্থ পর্যালোচনা করলে যে তাত্ত্বিক ধারণা পাওয়া যায়, তাতে এরা কেউ আদিবাসী কোটায় পড়েনা[৩৯]। এদের ইতিহাস ও 'আদিবাসী' শব্দের সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে রাজশাহী অঞ্চলের সাঁওতাল, ওরাওঁ, পাহাড়িয়া, মাহালী, প্রভৃতি জাতিগুলিকে বাসস্থানগতভাবে আদিবাসী বলা যায় না। কারণ এদের আদি বাসস্থান এখানে নয়। ভারতের বিহার রাজ্যের পুরাতন সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলের পাহাড়, ছোট নাগপুর, পালামৌ দামন-ই কোহ্ প্রভৃতি স্থানে তারা বসবাস করত[৪০]। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশের এ অঞ্চলসমূহে রেলপথ স্থাপন, সড়ক নির্মাণ, চা বাগান রচনা, হালচাষ প্রভৃতি কাজে তারা কাজের সন্ধানে আসতে থাকে। তা ছাড়া, রাজশাহী, মালদহ, বগুড়া, দিনাজপুর অঞ্চলের বড় বড় ভূ-স্বামী জমিদারগণ বন-জঙ্গল বিনাশ করে কৃষি জমি উদ্ধারের কাজে তাদের শ্রমিক হিসেবেও নিয়ে আসতেন।

এই সব শ্রমিকদের কেউ কেউ তাদের মূল বাসস্থানে ফিরে গেলেও, কিছু লোক আস্তে আস্তে এখানে বসতি গড়ে তোলে। এখন বরেন্দ্র অঞ্চলে যে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুন্ডা, পাহাড়িয়া , হাজং প্রভৃতি জাতি বাস করছে, তারা ঐ সব শ্রমিক জনগোষ্ঠীর অধঃস্তন পুরুষ[৪১]। প্রাচীন কাল থেকেই তারা পূর্ব পুরুষদের নিকট থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে, নিজেদের সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় তারা রক্ষণশীল। তাদের নিজস্ব ভাষা, আলাদা দৈহিক গঠনসহ অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্য ও সত্তা রয়েছে, যা তাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। আবার, তাদের আচার-আচরণ, অনুষ্ঠানাদি বিংশ শতাব্দীতেও আদিম পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়ে আসছে[৪২]। তাই তারা আদি বাসস্থান ব্যতীত 'আদিবাসী' হিসেবে পরিচিত। সাধারণ অর্থে তাদের উপজাতিও বলা হয়ে থাকে। আমরা এ গ্রন্থে তাদের আদিবাসী বলেই উল্লেখ করেছি, যদিও এ বিষয়ে নৃ-তাত্ত্বিক বিতর্ক রয়েছে।

রাজশাহী অঞ্চলে সাঁওতাল, ওরাওঁসহ ১২ ধরণের আদিবাসী মানুষ বসবাস করে। এ ছাড়া গোটা বাংলাদেশে মগ, মুরং, চাকমা, গারোসহ প্রায় ২৭ টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ আছে।

www.pathagar.com

টেবিল : ১ বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও তার সংখ্যা [৪৩]

ক্রমিক	জনগোষ্ঠীর নাম	সংখ্যা
১	চাকমা	২৫২৮৫৮
২	সাঁওতাল	২০২১৬২
৩	গারো	৬৪২৮০
৪	ত্রিপুরা	৮১০১৪
৫	মারমা	১৫৭৩০১
৬	বম	১৩৪৭১
৭	খুমী	১২৪১
৮	চাক্	২১২৭
৯	খীয়াং	২৩৪৩
১০	লুশাই	৬৬২
১১	ম্রো	১২৬
১২	মুরং	২২১৭৮
১৩	পাংখো	৩২২৭
১৪	রাখাইন	১৬৯৩২
১৫	তঞ্চংগ্যা	২১৬৩৯
১৬	বুনো	৭৪২১
১৭	হাজং	১১৫৪০
১৮	হরিজন	১১৩২
১৯	খাসি	১২২৮০
২০	কোচ	১৬৫৬৭
২১	মাহালী	৩৫৩৪
২২	মনিপুরি	২৪৮৮২
২৩	মুন্ডা	২১৩২
২৪	ওরাওঁ	৮২১৬
২৫	পাহাড়ীয়া	১৮৫৩
২৬	রাজবংশী	৭৫৫৬
২৭	উরূয়া	৫৫৬১
২৮	অন্যান্য উপজাতি	২৬১৭৪৩
মোট		১২০৫৯৭৮

www.pathagar.com

সাঁওতাল

রাজশাহী তথা বরেন্দ্র অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং আদিবাসীদের মধ্যে খ্রিস্টান মিশনারীরা ধর্ম প্রচারে বিশেষভাবে সফলতা পেয়েছেন সাঁওতালদের মাঝে[৪৪]। এদের দৈহিক গঠন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে; গাত্রবর্ণ কালো, নাসিকা চ্যাপ্টা, ঠোঁট মোটা, চুল কোকড়ানো এবং দৈহিক উচচতা মাঝারী ধরনের। নৃতাত্ত্বিকগণ এদেরকে আদি অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর প্রাক দ্রাবিড় বলে চিহ্নিত করেছেন[৪৫]। সাঁওতালরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। সাঁওতালী ভাষায় এই গোত্রগুলিকে ' প্যারিস' বলা হয়। গোত্রগুলি হচ্ছে হাঁসদা, মুরমু (মুর্ম্মু), হ্যামব্রম, মারান্ডি, সোরেন (সরেন), টুডু, বাসিক, কিস্কু, বেশরা, চুঁড়ে, পাউরিয়া ও চিলবিলি[৪৬]। তাদের নামের সাথে গোত্র উল্লেখ থাকে। যেমন, *লুসিয়া হেমব্রম, রজনী মুর্ম্মু* ইত্যাদি।

ইংরেজ সরকার ও জমিদারগণ সাঁওতালদের সাঁওতাল পরগণা থেকে বরেন্দ্র অঞ্চলে এনে কাজে লাগিয়েছিল। তবে ব্যাপকভাবে তারা সাঁওতাল পরগণাতে বসতি স্থাপন করে। এ অঞ্চলে তারা বন জঙ্গল কেটে জমি বের করত এবং সেসব জমিতে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হত। সরকার আবার এসব জমি জমিদারদের মাধ্যমে সাঁওতালদের বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এভাবে সাঁওতালরা কিছু কিছু জমির মালিক হয়। কিন্তু জমির মালিক হওয়া মানে তো সময় মত খাজনা দেয়ার ব্যাপার। সরকার কিংবা জমিদাররা প্রথমে বিনা খাজনায় কিংবা নামমাত্র খাজনায় তাদের জমি দিয়ে পরে আবার খাজনা আদায় করতে থাকে। এটা সাঁওতালদের কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি। তাদের মতে, 'জমি ঈশ্বরের দান। তারা পারিশ্রম করেই এতে ফসল ফলান। এতে জমিদারকে খাজনা দিতে হবে কেন?' খাজনার দাবী মেটাতে অনেক সাঁওতাল মহাজনদের কাছে ঋণী হয়ে পড়ে। ফলে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে বিদ্রোহ দানা বেধে ওঠে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৫ সালে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ। সিধু ও কানু নামক দু' বিপ্লবী ভাইয়ের নেতৃত্বে প্রায় ৩০ হাজার সাঁওতাল ইংরেজ সরকার, জমিদার ও হিন্দু ব্যবসায়ী অত্যাচারীর বিরূদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের অস্ত্র ছিল ঢাল-তরবারী ও তীর ধনুক। ব্রিটিশ সরকারের বন্দুকের গুলিবর্ষণে অবশ্য সেই বিদ্রোহের অবসান হয়েছিল বটে। তবে সেই বিদ্রোহে ১০ হাজার সাঁওতাল জীবন দিয়ে শোষণের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। সাঁওতালদের এই বিদ্রোহ বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল ও সংগ্রামী অধ্যায়।

www.pathagar.com

১৮৫৫ সালের বিদ্রোহ অবদমিত হবার পর সাঁওতালরা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন স্থানে। খাদ্য ও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বাংলাদেশের বরেন্দ্র এলাকায়ও চলে আসে তাদের অনেকেই। রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলে তারা ব্যাপকভাবে বসতি গড়ে তোলে। অত্যাধিক পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও সাঁওতালরা বরাবরই থেকেছে অসহায় ও দরিদ্র। বরেন্দ্র এলাকার জমি চাষযোগ্য করার পরও তারা জমির মালিক হতে পারেনি খাজনা ও জমিদারদের কারণে। জমি চাষযোগ্য হলেই জমিদার খাজনা চেয়ে বসত, এবং সাঁওতালরা অন্য পতিত জমিতে বসতি স্থাপন করে চাষবাস শুরু করত। এভাবেই বরেন্দ্র এলাকার হাজার হাজার একর জমি সাঁওতালদের প্রচেষ্টায় চাষযোগ্য হয়েছে বটে কিন্তু সাঁওতালরা দারিদ্রের তিমিরেই রয়ে গেছে।

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রধানতম টার্গেট উপজাতীয় সম্প্রদায় এবং উপজাতীয়দের মধ্যে সাঁওতালরাই তাদের কর্মের আওতায় এসেছে প্রথমে। খ্রিস্টান মিশনারীরা দিনাজপুরের সাঁওতালদের মধ্যে কাজের মাধ্যমে এদেশে তাদের মিশনারী তৎপরতা শুরু করেছিল। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত, অনাহারী, অর্ধাহারী আদিম চিন্তা চেতনার উত্তরাধিকারী সহজ সরল-প্রাণ এই মানব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জীবনে প্রকৃত আঘাত এসেছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে[৪৭]।

বাংলাদেশের অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর মতই সাঁওতালদের সংখ্যা নিয়েও অস্পষ্টতা আছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ১৯৭৪, ১৯৮১ ও ১৯৯১ সালে মোট তিনবার আদমশুমারী হয়েছে। ১৯৭৪ ও ১৯৮১ সালের শুমারীতে আদিবাসীদের আলাদাভাবে গণনা করা হয়নি। ১৯৮১ সালে আলাদাভাবে দেখানো হলেও তাদের জেলা ভিত্তিক কোন হিসাব দেওয়া হয়নি। তবে ১৯৯৬ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রদত্ত তথ্য অনুসারে সমগ্র বাংলাদেশে সাঁওতাল পরিবারের সংখ্যা ৪০,৯৫০, এবং মোট জনসংখ্যা ২০২৭৪৪ জন[৪৮]।

রাজশাহী জেলায় সাঁওতালদের সংখ্যা নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী পরিসংখ্যানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থা প্রভৃতি প্রদত্ত তথ্যকে এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কারণ, তারা মাঠ পর্যায়ে কর্মতৎপর। ১৯৮৫ সালে আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায় রাজশাহী জেলায় সাঁওতাল সংখ্যা ৪১০০২ জন[৪৯]।

মাহালী

রাজশাহী অঞ্চলের আর একটি আদিবাসীর নাম হলো মাহালী। রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়ায় প্রধানত তারা বসবাস করেন। মাহালীরাও প্রথমদিকে সাঁওতাল

www.pathagar.com

পরগণা থেকে এসে এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। মাহালীগণ প্রধানতঃ পাঁচটি গোত্রে বিভক্ত; যথা - বাঁশ ফোঁড় মাহালী, পাখার মাহালী, সুলক্ষী মাহালী, তাঁতি মাহালী এবং মাহালী মুন্ডা। নৃতাত্ত্বিকদের মতে তারা আদি অষ্ট্রিক। বরেন্দ্র অঞ্চলে আদিবাসীদের জাতিভিত্তিক একটি বেসরকারী হিসেব মতে বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলায় প্রায় ১৫ হাজার মাহালী বসবাস করেন[৫০]। আদিবাসীদের মধ্যে মাহালী জাতির সংখ্যা ৫.৭ শতাংশ। শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় মাহালীরা অনেকটা এগিয়ে আছে[৫১]।

ওরাওঁ

ওরাওঁদের নিবাস প্রধানত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যেই সীমিত। এ অঞ্চলের ১৬টি জেলার মধ্যে লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও পাবনা ব্যতীত অপর ১২টি জেলাতেই রয়েছে তাদের বাস। এ ছাড়া কিছু সংখ্যক ওরাওঁ বাস করছে গাজীপুর, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায়। হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার চা বাগানেই মূলত তারা দীর্ঘদিন যাবৎ কর্মরত।

পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীনতা উত্তরকালের বাংলাদেশের আদমশুমারীগুলোতে ওরাওঁদের স্বতন্ত্রভাবে গণনা করা হয়নি। অতি সম্প্রতি হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন নামক একটি বেসরকারী সংস্থা ওরাওঁদের উপর একটি জরীপ সম্পন্ন করে। জরীপের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশের ওরাওঁ পরিবার আছে ২১৫০৫ টি। মোট জনসংখ্যা ৮৫০৪১ জন। তন্মধ্যে পুরূষ ৪৩৭৬৫, মহিলা ৪১২৭৬ জন। এ প্রতিবেদন থেকে লক্ষ্য করা যাচেছ সব চেয়ে বেশী ওরাওঁ জনগোষ্ঠীর বাস নওগাঁ জেলায়। নওগাঁয় ওরাওঁ বাস করে মোট ৩১৮৩৪ জন। রাজশাহী জেলায় (বর্তমান জেলা) ১১২১৮, চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় ৫৪০৪, নাটোর জেলায় ৩০৯১ জন ওরাওঁ বাস করে। রাজশাহীর গোদাগাড়ী, নওগাঁর পত্নীতলা, নিয়ামতপুর ও পোরশা থানায় সবচেয়ে বেশী ওরাওঁ জনগোষ্ঠীর বাস[৫২]।

ওরাওঁরা বাংলাদেশের ভূমিজ সন্তান নয়। নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা, এদের আদিবাস ছিল উড়িষ্যা, ছোট-নাগপুর ও রাজমহলের পার্বত্য এলাকায়। অন্যান্য আদিবাসীদের মত এরাও তৎকালীন জমিদারদের প্রলোভনে পড়ে রাজস্ব মওকুফের লোভে জঙ্গল পরিস্কার করে আবাদী জমি তৈরী করতে এতদঞ্চলে আসে।

ওরাওঁরা 'কুড়ুখ' ও 'শাদরী' নামে দুটি ভাষায় কথা বলে। রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জের ওরাওঁরা শাদরী ভাষায় কথা বলে। এটি কুড়ুখ, উড়িয়া, উর্দু, হিন্দী,

www.pathagar.com

ফারসী ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে তৈরী একটি উপভাষা। ওরাওঁ সমাজ নানা গোত্রে বিভক্ত। উত্তরবঙ্গের ওরাওঁদের মধ্যে প্রায় ২০টির মতো গোত্র রয়েছে। গোত্রগুলি হলো - টপ্য, তিগ্‌গা, লাকড়া, পান্ন, মিন্তি, খালকো, কুজুর ইত্যাদি। ওরাওঁ আদিবাসী লোকদের নামের শেষে তাদের গোত্রের নাম 'টাইটেল' হিসেবে লেখা থাকে। যেমন তাদের দু'একটি নাম এমন- অর্পা কুজুর, জাসিন্‌তা লাকড়া ইত্যাদি[৩]।

ওরাওঁরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। এছাড়া তারা 'নাসনা' অর্থাৎ ডাইনিতে এবং প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে। তাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব বেশী পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে তারা লক্ষ্মী ও স্বরস্বতী পূজা করে থাকে[৪]। শিক্ষার হার ওরাওঁদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশী।

তথ্যসূত্র

---

১. মাখন লাল চৌধুরী, *ভারতবর্ষের ইতিহাস (৩য় খন্ড)*, প্রকাশ মন্দির প্রা.লি. কলকাতা, পৃ. ৬।

২. কথিত আছে যে, সম্রাট শাহজাহানের দু'জন বাঁদীকে পর্তুগীজরা অপহরণ করেছিল। ফলে সম্রাট তাদের প্রতি রুষ্ট হন। দ্রষ্টব্যঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)*, কলকাতা, মাঘ ১৩৮১, পৃ. ১৮৬-১৯২।

৩. *তদেব*, পৃ. ১৮৬।

৪. কে পি সেন গুপ্ত, *ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীজ ইন বেঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ১৫।

৫. প্রমথ নাথ বোস, *এ হিস্ট্রি অব হিন্দু সিভিলাইজেশন ডিউরিং ব্রিটিশ রোল*, ভলিউম -১, লন্ডন, ১৯৭৫, পৃ. ৫৬ ।

৬. কে পি সেন গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮।

৭. মাখন লাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।

৮. কে পি সেন গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১- ১৪।

৯. এম. লরিদ, *মিশনারীজ এন্ড এডুকেশন ইন বেঙ্গল* (১৭৯৩-১৮৩৭), অক্সফোর্ড, ১৯৭২, পৃ. ৬৩।

১০. কে পি সেন গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

১১. *তদেব*, পৃ.৮৮।

১২. অসিত কুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৮৯।

৩০. কে পি সেন গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯০।

১৪. *তদেব*, পৃ. ৯৪।

১৫. কে পি সেন গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১।

১৬. অসিত কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮২।

১৭. জে. রিস্টার, *এ হিস্টরী অব মিশনস্ অব ইন্ডিয়া*, এডিনবুর্গ, ১৯০৮, পৃ. ১৫০।

১৮. মাখন লাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২।

www.pathagar.com

১৯. কে পি সেন গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬
২০. কে পি সেন গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০১।
২১. এম. এ লরিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭।
২২. *তদেব*, পৃ. ৪৭।
২৩. কে পি সেন গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।
২৪. মোঃ রুহুল আমীন, *বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের তৎপরতা*, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৬।
২৫. *তদেব*, পৃ. ১৭।
২৬. *তদেব*, পৃ. ১৮।
২৭. এবনে গোলাম সামাদ, *রাজশাহীর ইতিবৃত্ত*, রাজশাহী, ১৯৯৯, পৃ. ৭৭।
২৮. *তদেব*, পৃ.১৯।
২৯. *তদেব*, পৃ. ১৯।
৩০. *তদেব*, পৃ. ১৯
৩১. *তদেব*, পৃ. ২১।
৩২. এ বি এম নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশে অমুসলিম মিশনারীদের তৎপরতা*, কাউন্সিল ফর ইসলামিক সোসিও কালচারাল অর্গানাইজেশন্স, ১৯৮৫, পৃ. ১১।
৩৩. মোহাম্মদ মোয়াজ্জেদ্দীন হামিদী , *খ্রিস্টান মিশনারীদের অশুভ পায়তারা* (মিশনারী কর্মকান্ডের উপর দৈনিক আজাদ, জাহানে নওসহ বিভিন্ন পত্রিকায় মওলানা আকরাম খাঁ, মওলানা মোহাম্মদ শামসুল হক প্রমূখের লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন), হামিদপুর, খুলনা, ১৩৭৪ (বাংলা), পৃ. ২২-২৩।
৩৪. মোঃ রূহুল আমীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।
৫০. ১৯৬১ সালের জনসংখ্যা রিপোর্ট, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত।
৩৬. ফাদার লুইজি পিনোস পিমে, *'উত্তরবঙ্গে ক্যাথলিক মন্ডলীর শুভ সূচনা ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ'*, আসাদ এভিনিউ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৪।
৩৭. ১৯৩১ সালের ইন্ডিয়া জনসংখ্যা রিপোর্ট, ভলিউম -৪, পৃ. ৪০৭।
৩৮. রেভারেন্ড সালকু মুর্ম্মু, *সাঁওতাল মন্ডলীর সুবর্ণ জয়ন্তী*, মার্চ ২০০০, বেলঘরিয়া - পাইতাপুকুর, রাজশাহী।
৩৯. প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার, 'বরেন্দ্র অঞ্চলের আদিবাসী', *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, রাজশাহী, ১৯৯৮, পৃ. ১৪৫।
৪০. আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, 'বরেন্দ্রভূমির চিরায়ত বাসিন্দা- নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান', *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, রাজশাহী ১৯৯৮, পৃ.১৪১।
৪১. তদেব, পৃ. ১৪১।
৪২. প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬।
৪৩. জনসংখ্যা রিপোর্ট, ১৯৯১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
৪৪. এবনে গোলাম সামাদ, *প্রাগুক্ত*, রাজশাহী, ১৯৯৯, পৃ. ৭৫।
৪৫. প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬।
৪৬. আব্দুল জলিল, *বাংলাদেশের সাঁওতাল : সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃ. ১৩।

www.pathagar.com

৪৭. আব্দুল জলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০।
৪৮. বাংলাদেশের পরিসংখ্যান পকেট বই, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৮।
৪৯. আব্দুল জলিল, *প্রাগুক্ত*, পরিশিষ্ট অংশ।
৫০. প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭।
৫১. *তদেব*, পৃ. ১৫১।
৫২. আব্দুল জলিল, *'উত্তরবঙ্গের আদিবাসী, লোক জীবন ও লোক সাহিত্য: ওরাওঁ'*, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ১৯৯১, পৃ. ৪২-৪৩ ।
৫৩. *তদেব*।
৫৪. প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিবাসীদের মাঝে খ্রিস্টান মিশনারী কর্মকান্ড

খ্রিস্টান মিশনারীরা এদেশে এসেছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে এবং তারা ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ইংরেজরা চলে গেলেও মিশনারীরা ভারত ও পাকিস্তান সরকারের অনুমোদন নিয়েই তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এখানে মিশনারীরা বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থার আড়ালে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন। সময়ের ব্যবধানে তাদের তৎপরতা এত বেড়ে যায় যে, আস্তে আস্তে বাংলাদেশে বেসরকারী সাহায্য সংস্থা ও মিশনারী কার্যক্রম একাত্ম হয়ে যায়। অন্যভাবে বলা যায়, অনেক মিশনারী সংস্থা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচী নিয়ে এনজিও (Non-Government Organization. N.G.O) কার্যক্রমের সাথে একাকার হয়ে যায়। এ সকল সংস্থা ধর্ম প্রচারের কাজ, ঋণ প্রদান, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যসেবা এবং গণশিক্ষার কাজ এক সাথে চালায় এবং খ্রিস্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলি এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পাশাপাশি সাহায্য ও সেবামূলক কাজগুলোও করে। কিন্তু তাদের সকল কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো গ্রামীণ দরিদ্র মানুষগুলোকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা[১]।

মিশনারী প্রতিষ্ঠান ও এনজিও

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি পরিচালনার জন্য ১৯৬১ সালে প্রণীত হয় 'দি ভলান্টারী সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এজেন্সিজ (রেজিস্ট্রেশন এন্ড কন্ট্রোল) এ্যাক্ট ১৯৬১'। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ১৯৬১ সালের এ্যাক্ট অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধিত ও পরিচালিত হতো। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের নয় মাস ব্যাপী মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বিরাট সংখ্যক মানুষ বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শরনার্থী হিসেবে মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকে। সে সময় বাংলাদেশীদের সহযোগিতা করা ও স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পূণর্গঠনের কাজ পরিচালনার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি কর্মতৎপরতা চালাতে থাকে। এমতাবস্থায় এদের সংখ্যা ও পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বিদেশী

www.pathagar.com

এনজিওগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৭৮ সালে জারি করা হয় 'দি ফরেন ডোনার্স ভলেন্টারী এ্যাক্টিভিটিজ রেজুলেশন এ্যাক্ট ১৯৭৮'।

১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সরকার প্রতিষ্ঠা করে 'এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'। সকল বেসরকারী সংস্থার রেজিস্ট্রেশন, প্রকল্প অনুমোদন, অর্থ ছাড়করণ ইত্যাদি দায়িত্ব এনজিও ব্যুরো পালন করে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন।

কোন সংস্থা/যদি বাংলাদেশে বিদেশী কাউকে কোন পদে নিয়োগ করতে চায় তাহলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তার অনুমতিপত্র নিতে হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশী মিশনারীবৃন্দ আইনতঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে প্রত্যায়নপত্র নিয়েই এদেশে কাজ করার কথা। কিন্তু বাস্তবে এদেশে বিদেশী কতজন মিশনারী সরকারী নীতিমালা মেনে চলেন, কিংবা নীতিমালা মেনে না চলার কারণে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তা জানা যায়নি। একশ্রেণীর বিদেশী এনজিও কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রায়ই অনেক গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আসছে। যদিও তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছেন।

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এনজিওদের রেজিস্টেশন দিয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের হিসেব মতে ১৯৯৭ পর্যন্ত প্রায় ১৬ হাজার বেসরকারী সাহায্য সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করছে। এর মধ্যে ১২৩টি এনজিও সরাসরি বিদেশী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত এবং বিদেশী অনুদান লাভ করে থাকে। বিদেশ থেকেই আসে তাদের অর্থ ও মানব সম্পদের চালান। এদের নীতি, কর্মপন্থা, কর্মক্ষেত্রের আওতা, প্রশাসনিক কাঠামো সবই দাতাদেশ নির্ধারণ করে দেয়। এদেশে কাজ করার জন্য তাদের এদেশের সরকারী নীতি, পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলার কথা।

বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির মধ্যে বাংলাদেশে কার্যরত আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৬ টি, যুক্তরাজ্যের ১৫ টি, অস্ট্রেলিয়ার ৭ টি, কানাডার ৯ টি, সুইডেনের ৯ টি, নরওয়ের ৫টি, ফ্রান্সের ৫ টি, ডেনমার্কের ৫ টি, নেদারল্যান্ডের ৫ টি, ইতালীর ৩ টি, ফিনল্যান্ডের ২ টি, জাপানের ৭ টি, ভারতের ৩টি এনজিও কাজ করছে। এছাড়াও আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, বেলজিয়াম, পর্তুগালের এক বা একাধিক এনজিও বাংলাদেশে কাজ করছে। মুসলিম দেশসমূহের মাত্র ১০ টি এনজিও সীমিত পরিসরে বাংলাদেশে কাজ করছে[২]।

এ সমস্ত এনজিও'র মধ্য থেকে কিছু এনজিও দেশের আদিবাসীদের মাঝে আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীর মাধ্যমে খ্রিস্টান মিশনারীদের অনুকূলে কাজ করছে এবং

www.pathagar.com

মিশনারীদের সহযোগী ভূমিকা পালন করছে। আবার কিছু এনজিও সরাসরি চার্চের সাথে সংশ্লিষ্ট। তারা চার্চের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার ও প্রসারে এসব এনজিওর অবদানই সর্বাধিক।

সুতরাং বাংলাদেশে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার ও প্রসারে এক শ্রেনীর এনজিও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছে বলা যায় এবং এক্ষেত্রে এনজিও ও মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলি মিশে একাকার হয়ে গেছে। পূর্বে কিন্তু তারা সরাসরি মিশনারী কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন। রাজশাহীর আদিবাসীদের মাঝে খ্রিস্টান ধর্মের সংশ্রবের ইতিহাস একদিকে যেমন বেশ দীর্ঘতর, অন্যদিকে স্পষ্টও বটে।

বাংলাদেশে কর্মরত খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশে খ্রিস্ট ধর্মের প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের তৎপরতা আছে। তবে এদেশে ক্যাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু। আদিবাসীদের মাঝেও কার্যক্রমেও তারাই অগ্রসর এবং সংখ্যায় অধিক।

ক্যাথলিক

বাংলাদেশের ক্যাথলিকরা ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কলকাতার অধীন ছিল। ১৯৬০ সালে ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের কেন্দ্রবিন্দু ভ্যাটিক্যান থেকে পোপ জন পল বাংলাদেশকে 'আর্চ ডায়োসিস' বা ধর্ম প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেন। বাংলাদেশ বর্তমানে ৬টি ডায়োসিস বা ধর্ম প্রদেশে বিভক্ত, যথা- ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর , খুলনা, রাজশাহী এবং ময়মনসিংহ। শেষোক্ত দুটি ডায়োসিস পরে হয়েছে। পূর্বে ৪টি ডায়োসিসে বিভক্ত ছিল। ডায়োসিস প্রধানকে বলা হয় বিশপ। আর বাংলাদেশে ক্যাথলিক প্রধান হলেন আর্চ বিশপ (যাকে বলা হয় ঢাকার বিপশ, ক্যাথলিক)। বাকী ৫ জন বিশপ তাঁর অধীন। আর আর্চ বিপশ সরাসরি পোপের অধীন।

এক একটি ডায়োসিস বা ধর্ম প্রদেশ আবার অনেকগুলি 'ধর্মপল্লী' নিয়ে গঠিত। ধর্মপল্লীর প্রধানকে বলা হয় 'পালক-পুরোহিত' বা ফাদার। রাজশাহী ধর্ম প্রদেশটি রাজশাহী, নবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাটের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। রাজশাহী ধর্ম প্রদেশ বা ডায়োসিসের প্রধান কার্যালয় বিমান বন্দর সড়কে বিশপ হাউস, ওমরপুর, সপুরা, রাজশাহীতে অবস্থিত। ১৯৯৪ সালে এই 'বিশপ হাউস' নির্মিত হয়।

রাজশাহীর আদিবাসীদের মাঝে ক্যাথলিক সম্প্রদায় : রাজশাহী জেলায় ৪ টি ক্যাথলিক ধর্ম পল্লী আছে, সবগুলিই আদিবাসী অধ্যুসিত এলাকায়। সেগুলি

www.pathagar.com

যথাক্রমে আন্ধারকোঠা, মহিপাড়া, ডিংগাডুবা ও শুড়সুনি পাড়ায় অবস্থিত। তন্মধ্যে আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লী সবচেয়ে পুরাতন। যদিও রাজশাহী অঞ্চলে ক্যাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আগমন ও বিস্তৃতি ঘটেছে প্রটেস্ট্যান্টদের অনেক পরে। কিন্তু বর্তমানে সংখ্যায় ক্যাথলিকরাই রাজশাহীসহ বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ অঞ্চলে খ্রিস্টান ধর্ম বিস্তার ঘটেছে আদিবাসীদের ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে। আর আদিবাসীদের রাজশাহী অঞ্চলে আগমনের অন্যতম উপলক্ষ্য ছিল ইশ্বরদী- আমনুরা (নবাবগঞ্জ জেলায়) রেলপথ নির্মাণের জন্য শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে আসা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই রেলপথ নির্মাণের পর আর আদিবাসীরা এই এলাকা ছেড়ে তাদের পরির্বতন বাসস্থানে চলে যাননি। আজও আদিবাসীদের গ্রামগুলিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, ইশ্বরদী থেকে রাজশাহী হয়ে যে রেলপথ নবাবগঞ্জ জেলার আমনুরায় চলে গেছে, তার দু'পাশে আদিবাসীদের আবাসস্থল।

এই আদিবাসীরা অতি শীঘ্রই রাজশাহীতে প্রেসবিটারিয়ান মিশনের বাণী প্রচারকদের সংস্পর্শ লাভ করে। তখন ক্যাথলিকদের কর্মকান্ড পরিচালিত হত কুষ্টিয়া জেলার 'ভবের পাড়া' মিশন থেকে। এই মিশনের পরিচালক ছিলেন ফাদার এস. তাভেজ্জিয়া। ফাদার তাভেজ্জিয়ার হাতে ১৯০৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী রাজশাহীর আন্ধারকোঠা ও দাইনপাড়ার বেশ কয়েকজন পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের আদিবাসী তরুণ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন[৩]। এভাবে আন্ধারকোঠা ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের একটা উল্লেখযোগ্য স্থানে পরিণত হয়।

১৯১৭ সালে আন্ধারকোঠার অদূরে কাকনহাটের নিকটে সুড়সুনিপাড়ার মাহালী আদিবাসীরা ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেন। তাদের দীক্ষাস্নান প্রদান করেন ফাদার জি. বি. এনসেলমো (পিমে)[৪], যিনি পরে দিনাজপুর ধর্ম প্রদেশের দ্বিতীয় বিশপ হয়েছিলেন। ১৯৩১ সালে ধর্মান্তরিত আদিবাসী সম্প্রদায় আন্ধারকোঠা-সুড়সুনিপাড়ার সাঁওতালদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হন এবং তাদেরকে খ্রিস্টধর্মের দিকে আকৃষ্ট করেন। দাইন পাড়ার পারু টুডু ও বড়তলার শ্যাম সরেন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যারা সাঁওতালদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে সক্রীয় হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেন।

১৯৫৪ সালে ধর্মান্তরিত সাঁওতালদের প্রভাবে পাশ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের ওঁরাও আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজন খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হন।

রাজশাহীর আন্ধারকোঠাকে ১৯০৭ সালে সাময়িকভাবে ক্যাথলিক ধর্মপল্লীরূপে উন্নীত করা হয়। কিন্তু পর পর তিন জন ফাদার বহু পরিশ্রম করার পরও সেখানকার আবহাওয়া এবং রোগপীড়ার মোকাবেলা করে সেখানে থাকার

www.pathagar.com

উপযোগী পরিবেশ করতে পারেননি, কিংবা বরেন্দ্র অঞ্চলের রুক্ষ পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেননি। ফলে ১৯১০ সালে এই মিশন কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়[৫]। এতে দেখা যায়, ধর্মান্তরিত আদিবাসীরা ক্যাথলিক মত ছেড়ে প্রেসবিটারিয়ান চার্চের দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করে। এ অবস্থায় আবারও ফাদার আনসেলমোকে আন্ধারকোঠা পাঠানো হয় ,যিনি স্বদেশভূমি ইতালীর হেনোয়া নগরে ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের পালকীয় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিলেন। অত্যন্ত ধৈর্যশীল এই ধর্ম প্রচারকের কারণে আদিবাসীরা পুনরায় ক্যাথলিক ধর্মমতে সক্রীয় হতে থাকে। ১৯২১ সালে আন্ধারকোঠা মিশন আবারও বন্ধ হয়ে যায়। কারণ ফাদার এনসেলমো তৎকালীন প্রতিকুল পরিবেশে তার বাসস্থান রহনপুরে স্থানান্তর করেন। তবুও আন্ধারকোঠা তার গুরুত্ব হারায়নি। বড়দিন ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনে রহনপুর থেকে একজন পুরোহিত ২/১ সপ্তাহের জন্য এখানে আসতেন।

১৯৩০ সালে আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীরূপে পুনরায় খোলা হয়। পুরোহিত হন ফাদার পি. কার্নেভাল পিমে। এই ধর্ম পল্লীতে যে সকল মিশনারী কাজ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফাদার ঘেস্‌সি (Ghezzi), ফাদার লুকাশ তপ্ন, ফাদার কাত্তাওনী, ফাদার পিনোস। ফাদার মাজ্জোওনী ছিলেন আন্ধারকোঠার একজন নিষ্ঠাবান বিশপ। কিন্তু ১৯৭২ সালে দেশের আইন শৃংখলাহীন পরিস্থিতিতে রাত্রীকালে নিজ কক্ষে আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন। পরবর্তী সময়ে ফাদার লিচার্দি, ফাদার কালাঙ্কি, ফাদার যাকোমেল্লী, ফাদার মার্কুস মারান্ডি প্রমূখ মিশনারী কাজ করেন।

আন্ধারকোঠাকে কেন্দ্র করে রাজশাহী অঞ্চলে ক্যাথলিক সম্প্রদায় বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে রাজশাহীর মহিপাড়াকে একটি উপকেন্দ্র হিসেবে চালু করা হয়। এভাবে রহনপুর(নবাবগঞ্জ জেলায়), সুড়সুনিপাড়া, ডিঙ্গাডোবায় ক্যাথলিক মিশনারী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজশাহী শহরে আন্ধারকোঠা থেকেই মিশনারী কাজ পরিচালিত হয়। বিশেষ করে রাজশাহী শহরে একটি নতুন ধর্মপল্লী স্থাপন করা হয়। একটি কনভেন্ট এবং ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে একটি গীর্জা নির্মিত হয়। ফাদারদের জন্য বাসভবন, রোগীদের জন্য একটি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে যা 'কারিতাস কমপ্লেক্স' নামে পরিচিত। রাজশাহী শহরের মহিষবাথান এলাকায় এর অবস্থান। আরও আগে থেকেই বরেন্দ্র এলাকার আদিবাসীরা শহরে কাজ করতে এসে এখানে বসবাস করতে থাকেন। আদিবাসী ছাড়াও ক্যাথলিক চাকুরীজীবি, ছাত্র-ছাত্রী এবং সেবিকা শহরে বসবাসের জন্য এসেছিল। যার ফলে ধাপে ধাপে সেখানে এক

www.pathagar.com

প্রাণবন্ত ক্যাথলিক সম্প্রদায় অস্তিত্ব লাভ করে। এভাবে রাজশাহী শহর ক্যাথলিক খ্রিস্টান সমাজের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে এবং ১৯৮৬ সালে ফাদার স্টিফেন গমেজকে রাজশাহীর পালক পুরোহিত নিয়োগ করা হয়।

বর্তমানে রাজশাহী শহরকে কেন্দ্র করে রাজশাহী ক্যাথলিক ধর্মপ্রদেশের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। ধর্ম প্রদেশের অধীনে 'ডিংগাডোবা ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী'সহ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাটের কিছু অংশসহ বরেন্দ্র অঞ্চলে ক্যাথলিক সমাজ তাদের কর্মকান্ড পরিচালিত করছে।

আদিবাসীদের মাঝে প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পরই বাংলাদেশে প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের স্থান। তাদের মধ্যে রাজশাহীতে চার্চ অব বাংলাদেশের অনুসারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাজশাহীতে প্রটেস্টান্ট খ্রিস্টানদের কবরস্থানও দেখাশোনা করে থাকেন 'চার্চ অব বাংলাদেশ' এর ফাদারগণ। তবে প্রটেস্ট্যান্টরা আবার কয়েকভাগে বিভক্ত। একটি হলো ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়। *উইলিয়াম কেরী* ছিলেন একজন ব্যাপটিস্ট মিশনারী। তিনি দিনাজপুরে যে ক্ষুদ্র চার্চ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটাই ছিল এদেশে প্রথম ব্যাপটিস্ট ও প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ। বর্তমানে বাংলাদেশে কর্মরত আছে ব্যাপটিস্টদের বিভিন্ন সম্প্রদায়। যথাঃ-

১. দি এসোসিয়েশন অব ব্যাপ্টিস্ট ফর ওয়ান্ড ইভানজেলিজম
২. দি ব্যাপটিস্ট ইউনিয়ন অব বাংলাদেশ
৩. দি গারো ব্যাপটিস্ট ইউনিয়ন ইত্যাদি। তা ছাড়াও প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানরা আরো কয়েকটি মন্ডলীতে বিভক্ত। এদের মধ্যে চার্চ অব বাংলাদেশ (এ্যাংলিকান চার্চ, বিটারিয়ান চার্চ) অন্যতম।

চার্চ অব বাংলাদেশ : প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বাংলাদেশে একটি বড় মিশনের নাম চার্চ অব বাংলাদেশ। এটি ইংল্যান্ডের প্রেসবিটারিয়ান চার্চ- *'চার্চ অব ইংল্যান্ড'* -এর এ-দেশীয় নাম। ১৯৭০ সালে লাহোরে কয়েকটি চার্চের সংযুক্তির মাধ্যমে চার্চ অব পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এর নামকরণ করা হয় চার্চ অব বাংলাদেশ। চার্চ অব বাংলাদেশ দুটি ডায়োসিস বা ধর্ম অঞ্চলে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যথাঃ

এক. ঢাকা ডায়োসিস। এই ডায়োসিসের মধ্যে আছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগসহ ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল অঞ্চল এবং বৃহত্তর খুলনা জেলা। ঢাকা ডায়োসিসের প্রধানকে বলা হয় প্রধান মর্ডারেটর এবং তিনি ঢাকার বিশপও। অর্থাৎ,

www.pathagar.com

ঢাকা ডায়োসিস প্রধান হলেন বাংলাদেশে চার্চ অব বাংলাদেশের ধর্মীয় প্রধান। দুই. কুষ্টিয়া ডায়োসিস। এটি কুষ্টিয়া, মেহেরপুর জেলাসহ গোটা রাজশাহী বিভাগকে নিয়ে গঠিত।

প্রত্যেকটি ডায়োসিস আবার কয়েকটি ডিনারী নিয়ে গঠিত। যেমন, কুষ্টিয়া ডায়োসিস দুটি ডিনারীতে বিভক্ত। এক. কুষ্টিয়া ডিনারী। দুই. রাজশাহী ডিনারী। ডিনারী প্রধানকে বলা হয় ডীন। রাজশাহী বিভাগ নিয়ে রাজশাহী ডিনারী গঠিত। প্রত্যেকটি ডিনারী কয়েকটি মন্ডলীতে বিভক্ত। মন্ডলী প্রধানকে বলা হয় পুরোহিত। এই হ'ল মোটামুটি চার্চ অব বাংলাদেশের সাংগঠনিক কাঠামো।

রাজশাহীতে প্রটেস্ট্যান্টদের কবরস্থান : রাজশাহীতে ইংরেজ আমলের খ্রিস্টানদের ২টি গোরস্থান আছে। যথা: (১.) রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের পশ্চিমে সি এন্ড বি অফিস সংলগ্ন গোরস্থান। প্রায় ২ বিঘা জমির উপর প্রাচীন কবরস্থানটি প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত। এখানে প্রায় শতাধিক সমাধি আছে। তবে অনেক কবরই নদীবক্ষে বিলীন হয়ে গেছে। যে সমস্ত কবর নদীতে নিমজ্জিত হয়ে গেছে সে সব সমাধির উৎকীর্ণ শ্বেত প্রস্তরলিপি এই গোরস্থানের পূর্ব পার্শ্বের প্রাচীর গাত্রে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। (২.) রাজশাহী গেজেটিয়ারের মতে, রাজশাহী শহরের দক্ষিণে পদ্মা নদীর তীরে বড়কুঠির প্রাঙ্গনস্ত গোরস্থানটি প্রাচীনতর। এই গোরস্থানে সমাহিত আছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকজন উচচপদস্থ কর্মচারী, নেপোলিয়ান বোনাপার্তের সেনা বিভাগের দু'জন ফরাসী সৈনিক। এখানে সমাহিতদের অধিকাংশকেই দেখা যায় উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে; অর্থাৎ ১৮০৬, ১৮০৮, ১৮২৬ প্রভৃতি সময়কালে। তবে বর্তমানে এই গোরস্থানের অধিকাংশই নদীগর্ভে প্রবেশ করেছে।[৬]

অন্যান্য খ্রিস্টান সম্প্রদায় ঃ ক্যাথলিক,প্রটেস্ট্যান্ট, ছাড়াও বাংলাদেশে আরও কার্যরত আছে বেশ কয়েকটি খ্রিস্টান সম্প্রদায়। যেমন, চার্চ অব গড, সেভেনথ্ ডে এ্যাডভেন্টিস্ট, লুথারান চার্চ, অল ওয়ান ইন খ্রিস্ট, দি এসোসিয়েশন অব গড, বাংলাদেশ নর্দান ইভানজেলিক্যাল চার্চেস, দি নিউ লাইফ সেন্টার, দি ওয়ান্ড মিশনারী ইভানজেলিজম, খ্রিস্ট ধর্ম সভা ইত্যাদি অন্যতম ।

জাতীয় চার্চ পরিষদ : জাতীয় চার্চ পরিষদ কোন একক চার্চ এর নাম নয়। এটি প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ সমূহের সামাজিক ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সেবামূলক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় চার্চ পরিষদ। এটি চার্চ সমূহের মধ্যে সমন্বয় করে থাকে।

www.pathagar.com

বাইবেল সোসাইটি বাংলাদেশ : বাইবেল সোসাইটি বাংলাদেশ হলো খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। সকল সম্প্রদায়ের খ্রিস্টানরাই এর সদস্য। ধর্মীয় গ্রন্থ বাইবেল প্রকাশ ও বিতরন এই সোসাইটির কাজ। বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটির প্রধান কার্যালয় ৩৯০, নিউ ইস্কাটন, ঢাকায়।

প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক মিশনের সহযোগিতায় বাংলাদেশে বহু এজেন্সী কাজ করছে, যারা সরাসরি মিশনারী কাজকর্ম করে না। তবে এদের কাজ হ'ল - অনুদান দ্বারা মিশনারীদের সহযোগিতা করা এবং মিশনারী কাজের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করা। উদাহরণ স্বরূপ প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের ইয়ং ক্রিস্টিয়ান ওয়ার্কার্স (Young Cristian Workers) এবং এভরি হোম কনটাক্ট (Every Home Contact) প্রভৃতি সংস্থার কথা বলা যায়। প্রটেস্ট্যান্ট সাহায্য ও অনুদানের সবচেয়ে বড় যে এজেন্সী রয়েছে, তার নাম খ্রীস্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (C.C.D.B)। রোমান ক্যাথলিকদের জন্য ঐ ধরনের বড় এজেন্সী হ'ল কারিতাস। এটি খুবই সুসংগঠিত এবং চার্চের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট।

বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে উপরোক্ত ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট মন্ডলীর বিভিন্ন সম্প্রদায় কার্যরত রয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ সকল সংস্থার শাখা প্রশাখার বিচরণ। চার্চ-সংস্থা ও চার্চকে সহায়তা দানকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মিলিয়ে এদেশে অনেক মিশনারী সংস্থা কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ৫২ টি সংস্থা এদেশে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার ও প্রসারে মিশনারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্থাগুলি হল[৭]। সেগুলি হল নিম্নরূপঃ

১. দি সলভেশন আর্মি
২. মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি
৩. সেভেন্থ ডে এ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ অব বাংলাদেশ
৪. বাংলাদেশ ফরেন মিশন বোর্ড
৫. ওয়ার্ল্ড মিশনারী ইভানজেলিজম
৬. এ্যাডভেন্টিস্ট ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিলিফ এজেন্সি ইন্টারন্যাশনাল
৭. নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটি
৮. বাংলাদেশ লুথার মিশন (ডেনিশ)
৯. ইন্টারন্যাশনাল ক্রিশ্চিয়ান ফেলোশিপ
১০. ব্যাপ্টিস্ট মিড মিশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

১১. নিউ লাইফ সেন্টার
১২. ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটি
১৩. সোসাল এন্ড ইনস্টিটিউশন বোর্ড
১৪. চার্চ অব গড মিশন
১৫. ক্রিশ্চিয়ান সার্ভিস সোসাইটি
১৬. কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট
১৭. ফিন্নিস ফ্রি ফরেন মিশন
১৮. এসোসিয়েশন অব ব্যাপ্টিস্ট .
১৯. ক্রিশ্চিয়ান রিফর্ম ওয়ার্ল্ড রিলিফ কমিটি
২০. ওয়ার্ল্ড মিশন অব বাংলাদেশ
২১. বাংলাদেশ লুথারেন মিশন (ফিন্নিস)
২২. ইয়ং উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
২৩. বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি
২৪. কলেজ অব ক্রিশ্চিয়ান থিওলজি
২৫. ক্রিশ্চিয়ান ন্যাশনাল ইভাজেলিজম
২৭. ওয়ার্ল্ড এরাইন্স অব ওয়াই এম সি এ বাংলাদেশ
২৮. ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ওয়াই এম সি এ বাংলাদেশ
২৯. দি এ্যাপোস্টোলেক চার্চ অব বাংলাদেশ
৩০. কালডেরী এ্যাপোস্টোলেক চার্চ
৩১. এ্যাসেম্বলস অব গড মিশন
৩২. বাংলাদেশ লুথার মিশন (নরওয়েজিয়ান)
৩৫. জাতীয় চার্চ পরিষদ
৩৬. দি চার্চ অব বাংলাদেশ,সোসাল ডেভেলপরেমন্ট প্রোগ্রাম
৩৭. ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ডি সে এ
৩৮. রেইনবো হাউস ইন্টারনাশনাল
৩৯. ক্রিশ্চিয়ান লাইফ বাংলাদেশ
৪০. কোনোনেয়া
৪১. লাইফ বাংলাদেশ
৪২. ক্রিশ্চিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ
৪৩. কারিতাস বাংলাদেশ
৪৪. সুইডিস ফ্রি মিশন
৪৫. হিড বাংলাদেশ
৪৬. ক্রিশ্চিয়ানস ফাউন্ডেশন হোমস

www.pathagar.com

৪৭. এ্যাকশন এইড
৪৮. ওয়ার্ল্ড ভিশন প্লেয়ার লীগ
৪৯. আইডিয়াস ইন্টারন্যাশনাল
৫০. রংপুর-দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস
৫১. দ্বীপ শিখা
৫২. ওয়ার্ল্ড ভিশন[৮]।

তাছাড়াও বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে নিয়োজিত আছে এমন কয়েকটি সংস্থা হলো:

১. মসীহী জামাত
২. ওয়াচ টাওয়ার বাইবেল ট্রাক্ট সোসাইটি (Watch Tower Bible Tract Society)
৩. ফুড ফর দ্য হাংরী ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি।

মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১. নটরডেম কলেজ, ঢাকা
২. হলিক্রস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
৩. সেন্ট জোসেফ স্কুল, ঢাকা ও দিনাজপুর
৪. সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল, ঢাকা
৫. এ্যাডভেন্টিস্ট ইউনিভার্সিটি এন্ড সেমিনারী (বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়), কালিয়াকৈর, গাজীপুর
৬. মিশন গালর্স হাইস্কুল, কোর্ট, রাজশাহী

খ. হাসপাতাল

১. খ্রিশ্চিয়ান মিশন হাসপাতাল, রাজশাহী
২. ফাতেমা হাসপাতাল, যশোর
৩. ল্যাম্ব হাসপাতাল, পার্বতীপুর, দিনাজপুর
৪. খ্রিশ্চিয়ান মিশন হাসপাতাল ও খ্রিশ্চিয়ান কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র, চন্দ্রঘোনা, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।
৫. খ্রিশ্চিয়ান মিশন হাসপাতাল, বল্লভপুর, মেহেরপুর।

www.pathagar.com

কার্যরত কয়েকটি মিশনারী প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে বাংলাদেশে কর্মরত কয়েকটি মিশনারী প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি আলোচনা করা হলো:

স্যালভেশন আর্মি: সারা বিশ্বের ৭০ টিরও বেশী দেশে সক্রীয়ভাবে কর্মরত একটি খ্রিস্টান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হলো 'স্যালভেশন আর্মি'। এর প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম বুথ। তিনি ১৮২৯ সালে নটিংহামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারই ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'স্যালভেশন আর্মি' নামক প্রতিষ্ঠানটি ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত ক্রিশ্চিয়ান মিশন নামেই পরিচিত ছিল এবং তখন পর্যন্ত সংস্থার কর্মীদেরকে সাধারণ স্বেচছাসেবী হিসেবেই বিবেচনা করা হত। 'স্যালভেশন আর্মি' নাম গ্রহণ করার পর সংস্থাটিকে সামরিক কায়দায় ঢেলে সাজানো হয়। স্যালভেশন আর্মির স্লোগান হচেছ 'Army Without Guns' (অস্ত্রবিহীন সৈনিক)। সংস্থাটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদবীগুলি সামরিক ধাঁচের। যেমন, স্যালভেশন আর্মিতে কর্মরত লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন, মেজর, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল, কর্ণেল এবং কমিশনার র‍্যাংকের অধিকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী আছে প্রায় ২৫ হাজারের অধিক। ইংল্যান্ড সরকার স্যালভেশন আর্মিকে রাজকীয় স্বীকৃতি প্রদান করেছে[৯]।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেয়া বাঙালী শরণার্থী শিবিরগুলিতে ত্রাণ তৎপরতা শুরুর মাধ্যমে স্যালভেশন আর্মির কর্মকান্ডের সাথে বাংলাদেশের মানুষের পরিচয় ঘটে। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সাল থেকে স্যালভেশন আর্মি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে কাজ করে যাচেছ[১০]।

ঢাকার মিরপুর, যশোর ও খুলনা জেলার বেশ কিছু এলাকায় স্যালভেশন আর্মির কর্মতৎপরতা আছে[১১]। বাংলাদেশে এর প্রধান অফিস ঢাকার বনানীতে। স্যালভেশন আর্মি বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি স্কুল পরিচালনা করছে। তাছাড়া যশোরসহ অন্যান্য কয়েকটি স্থানে সামাজিক কার্যক্রম বা Social Serviecs নামে প্রকল্প চালু আছে।

স্যালভেশন আর্মি যেহেতু খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থা সুতরাং স্বভাবতই তার কর্মসূচীতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিষয়টি নিবিড়ভাবে জড়িত থাকবে -এটা স্বাভাবিক। বেসরকারী স্বেচছাসেবী চেহারার আড়ালে ধর্মীয় কর্মকান্ডের বিষয়টি থাকায় এক সময় যশোর জেলা প্রশাসক ও এনজিও ব্যুরো স্যালভেশন আর্মির কর্মকান্ড তদন্ত করে দেখেছিলেন। তাদের পর্যবেক্ষণে স্যালভেশন আর্মির সেবামূলক কর্মসূচীর বাইরে ধর্মান্তর কার্যক্রম, স্কুলগুলিতে সরকার নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুসরণ না করা,

www.pathagar.com

স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের রবিবারে গীর্জায় যাওয়া বাধ্যতামূলক- ইত্যাদি অভিযোগ তোলা হয়েছিল[১২]।

সেভেন্থডে এডভেনটিস্ট চার্চ

এ্যাডভেনটিস্ট অর্থ যীশু খ্রিস্টের পুনরাগমন ও বিশ্ব জগতের আশু সমাপ্তীতে বিশ্বাসী ব্যক্তি। সেভেন্থ ডে এ্যাডভেনটিস্ট (S.D.A.) একটি প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান ধর্মীয় গ্রুপ[১৩]। এ্যাডভেনটিস্ট চার্চ এর অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তায়ালা ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম করেছেন। এই দিন টিকে তারা বলেন সাব্বাথ (Sabbath) দিন এবং এটি শনিবার। তারা শুক্রবার সূর্যাস্ত থেকে শনিবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাব্বাথ দিন ধরে এবং এই দিনটিকে তারা প্রার্থনার দিন হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রার্থণার দিন রবিবার হলেও একমাত্র ব্যতিক্রম এ্যাডভেনটিস্টগণ, তারা শনিবারকে সাপ্তাহিক ছুটি ও প্রার্থনার দিন হিসেবে পালন করে।

১৯০৬ সালে এ্যাডভেনটিস্ট চার্চ বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলা সদরে (বর্তমান) প্রথম তাদের কার্যক্রম শুরূ করেন। তার আগে ভারতবর্ষে প্রথম এ্যাডভেনটিস্ট চার্চের কার্যক্রম শুরূ হয়েছিল কলকাতায়। বাংলাদেশে এ্যাডভেনটিস্ট চার্চ এর অফিসিয়াল নাম 'বাংলাদেশ মিশন অব সেভেন্থ ডে এ্যাডভেনটিস্ট'। এর অফিস ঢাকার মিরপুরে। প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ নিয়ে গঠিত নির্বাহী কমিটি এটি পরিচালনা করে। বাংলাদেশ মিশনের প্রধান নির্বাহীর পদবী প্রেসিডেন্ট। পূর্বে এই পদকে বলা হতো কো-অর্ডিনেটর। এ্যাডভেনটিস্টগণ তাদের ধর্ম যাজকদের বলেন 'পামস্টার', অন্যরা যাকে বলেন বিশপ।

বাংলাদেশকে (তাদের ভাষায়- বাংলাদেশ ইউনিয়ন মিশন) এ্যাডভেনটিস্টগণ প্রধান ৪টি অঞ্চল বা সেকশনে বিভক্ত করেছেন। এগুলির নাম হ'ল:

১. পশ্চিমাঞ্চল (West Bangladesh Mission (WBM) of Seventh Day Adventist.)

২. পূর্বাঞ্চল (East Bangladesh Mission (EBM) of Seventh Day Adventist)

৩. উত্তরাঞ্চল (North Bangladesh Mission (NBM) of Seventh Day Adventist)

www.pathagar.com

৪.দক্ষিণাঞ্চল (South Bangladesh Mission (SBM) of Seventh Day Adventist)

এই চারটি সেকশনের মধ্যে রাজশাহী পড়েছে পশ্চিম সেকশনের মধ্যে। সেকশন প্রধানকে বলা হয় 'সেকশন পামস্টার'। পশ্চিম সেকশনের সদর দপ্তর জয়পুরহাট সদরে। একটি সেকশনের মধ্যে আছে আবার কয়েকটি সাংগঠনিক ডিস্ট্রিক্ট। কয়েকটি এলাকা নিয়ে এক একটি ডিস্ট্রিক্ট গঠিত। ডিস্ট্রিক্ট এর প্রধানকে বলা হয় ডিস্ট্রিক্ট পামস্টার। রাজশাহী ও নবাবগঞ্জ জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছে রাজশাহী ডিস্ট্রিক্ট। কয়েকটি ইউনিট (মন্ডলী) নিয়ে গঠিত হয় এক একটি ডিস্ট্রিক্ট। রাজশাহী জেলায় ২৩ টি ও নবাবগঞ্জ জেলায় ৩টি ইউনিট (মন্ডলী) নিয়ে গঠিত হয়েছে রাজশাহী ডিস্ট্রিক্ট। ইউনিট (মন্ডলী) প্রধানকে বলা হয় ইউনিট পামস্টার।

এ্যাডভেনটিস্ট চার্চ এর অনুসারীরা 'বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি' কর্তৃক প্রকাশিত বাইবেল অনুসরণ করেন। ধর্মীয় কর্মকান্ডের পাশাপাশি এ্যাডভেনটিস্টগণ বাংলাদেশে শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

দেশের বিভিন্ন স্থানে এ্যাডভেনটিস্ট চার্চের পরিচালনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কয়েকটি রাজশাহীতে অবস্থিত। তন্মধ্যে একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। রাজশাহীতে এ্যাডভেনটিস্টদের নিজস্ব কোন কবরস্থান এখন পর্যন্ত নেই। ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের ভিটে-মাটিতেই তারা মৃতদেহ কবরস্ত করে থাকেন। যাদের নিজের জমি নেই তারা নিকটস্থ চার্চের জমিতে কবর দেন। এ্যাভেনটিস্টদের জন্য নির্দিষ্ট কোন আবাসিক এলাকাও রাজশাহীতে নেই। তবে তানোর থানা সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে আদিবাসীরা, যারা এ্যাডভেনটিস্ট খ্রিস্টান, তারা সামাজিকভাবে বসবাস করছেন। রাজশাহী জেলায় মোট ২৩টি এ্যাডভেনটিস্ট চার্চ রয়েছে। প্রতিটি চার্চে সপ্তাহে গড়ে প্রায় ৩৫টি পরিবার প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সে হিসেবে প্রায় ৮২৫ টি এ্যাডভেনটিস্ট খ্রিস্টান পরিবার রাজশাহী জেলায় বসবাস করেন। তাদের সিংহভাগই অবশ্য আদিবাসী ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান।

ওয়ার্ল্ড ভিশন : ওয়ার্ল্ড ভিশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট একটি ক্যাথলিক খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থা। ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময় এই সংস্থা কুতুবদিয়া, চট্টগ্রামসহ দুর্গত অঞ্চলে ত্রাণ তৎপরতা চালায়। সে সময় ওয়ার্ল্ড ভিশনের নামে ধর্মান্তরের অভিযোগ উঠে। সংস্থার নির্বাহী প্রধান সি পি মানকিন একজন নবদীক্ষিত খ্রিস্টান[১৪]। তিনি ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদে ময়মনসিংহের

www.pathagar.com

গারো পাহাড় এলাকা থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ওয়ার্ল্ড ভিশনের বাংলাদেশ অফিস ঢাকার ধানমন্ডীতে। তাছাড়া ঢাকার লালমাটিয়া, চট্টগ্রাম, নেত্রকোনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, জামালপুর, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে আঞ্চলিক কার্যালয় আছে। ওয়ার্ল্ড ভিশন এসকল কেন্দ্রের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে[১৫]। খাদ্য ক্রয়, মেডিকেল সহায়তা, যানবাহন ও পোশাক প্রভৃতি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় ওয়ার্ল্ড ভিশন বাঙালী শরনার্থীদের সাহায্য করেছিল। ১৯৭২-৭৩ সালে সংস্থাটি ২৫০০ টি গৃহ ও ৩০ টি স্কুল নির্মাণ করে। ওয়ার্ল্ড ভিশনের পরিচালনায় স্কুলগুলির আবাসিক ব্যবস্থা আছে। তাদের পরিচালনায় প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে।

আর.ডি.আর.এস (RDRS-Rangpur-Dinajpur Rural Service) : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেয়া বাংলাদেশী শরণার্থীদের মাঝে কাজ করেছিল 'লুথারান ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন' নামে যে মিশনারী সংস্থাটি, তাই স্বাধীনতার পর রংপুর দিনাজপুর রিহেবিলেশন সার্ভিস নামে কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৮৬ সাল থেকে RDRS (Rangpur-Dinajpur Rural Service) নামে সেবাধর্মী কাজ পরিচালনা করে আসছে। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট, পুল- কালভার্ট নির্মাণ, স্কুল নির্মাণ ও মেরামত, পা চালিত নলকুপ ও বাঁশের পাইপের প্রচলন করে সেচ ব্যবস্থায় উন্নতি প্রভৃতি কাজ RDRS করে থাকে[১৬]।

উত্তরাঞ্চলের ৬টি জেলার ২৪৮টি ইউনিয়নের প্রায় দেড় লাখ মানুষের মাঝে RDRS কাজ করে যাচ্ছে[১৭]। এনজিও ব্যুরোর এসাইনমেন্ট অফিসার জনাব শহীদ বখতিয়ার আলীমের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, RDRS এ সুদের হার অত্যন্ত চড়া। ক্ষেত্র বিশেষে তা ২০০% বা আরো উপর। কর্মচারীদের বেতনের ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্য রয়েছে। সর্বনিম্ন বেতন যেখানে ৬০০/৭০০ টাকা, সেখানে সংস্থা প্রধান মি টরবেন ডি পিটারসন মাসিক প্রায় ৩ লাখ টাকার সুবিধা ভোগ করেন। ঐ প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায়, গত বিশ বছরে RDRS ২১৮ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪৭৬ টাকা ব্যয় করেছে। তবে রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের গ্রামীণ উন্নয়ন কতটা হয়েছে, তা পর্যালোচনার বিষয়।

এনজিও ব্যুরো রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে, RDRS নীরবে এবং কৌশলে রংপুর-দিনাজপুর এলাকার সীমান্তবর্তী আদিবাসী, বিশেষ করে সাঁওতাল অধ্যুসিত এলাকায় ধর্মপ্রচারে নিয়োজিত আছে[১৮]।

www.pathagar.com

সিসিডিবি (Christian Commission for Development in Bangladesh) : ইহা সুইজারল্যান্ডভিত্তিক একটি খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থা । ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন অব চার্চেস্, ঢাকা, সিসিডিবিকে অর্থ যোগান দেয়। ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস (জেনেভা), খ্রিস্টান এইড (ইংল্যান্ড), চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস (নিউজিল্যান্ড), ইন্টারন্যাশনাল চার্চ এইড (হলান্ড), এ্যাড ফর দি ওয়ার্ল্ড (জেনেভা) প্রভৃতি সংস্থা সিসিডিবি'র সাথে জড়িত আছে। স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে ১৩৩ মিলিয়ন ডলার খরচ করে ১৬টি প্রকল্পের মাধ্যমে সিসিডিবি প্রথম কার্যক্রম শুরু করে। মৎস, কৃষি, স্বাস্থ্য, ওয়েভিং প্রভৃতি সেক্টরে এই সংস্থার ব্যাপক কাজ রয়েছে[১৯]।

সিসিডিবির সদর দপ্তর ঢাকার মিরপুরে। মানিকগঞ্জের শিবালয়, বরিশালের গৌরনদী, নওগাঁর প্রসাদপর, রাজশাহীর তানোর, নবাবগঞ্জ জেলার সদর থানায়, পাবনার কালিকো কটন মিল এলাকায় ও সুজানগরে, ময়মনসিংহের ভালুকা ও বান্দরবনে সিসিডিবি প্রকল্প অফিস স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে[২০]। বান্দরবানে উপজাতীয় শরনার্থীদের মাঝে এবং ময়মনসিংহ, নওগাঁ, নবাবগঞ্জ, রাজশাহী প্রভৃতি এলাকার সংখ্যালঘু উপজাতীয় অধিবাসীরা সিসিডিবির টার্গেট গ্রুপ। বর্তমানে সংস্থাটির টার্গেট গ্রুপ সংখ্যা ৫ হাজারের বেশী[২১]।

সিসিডিবি'র নবাবগঞ্জ জেলার প্রসাদপুর প্রকল্প অফিসের প্রতিবেদনে দেখা যায়, সদর থানার ১৫টি ইউনিয়নের ২৪টি গ্রামে তারা কাজ করছে। সেখানে সংস্থার টার্গেটভূক্ত সংগঠিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১০ হাজার ৯৪০ জন। এর মধ্যে পুরুষ মাত্র ২০৪ জন আর মহিলা ১০ হাজার ৭৬৬ জন[২২]। ধর্মের বিষয়টি তারা রির্পোটে উল্লেখ করেনা। তবে এই একটি অফিসের প্রতিবেদন থেকে এই সংস্থার পরিচিতি কিছুটা আঁচ করা যায়।

হিড বাংলাদেশ (Healtn, Education and Economic Development of Bangladsh. সংক্ষেপে H.E.E.D Bangladsh) : ১৯৭১ সালে হিড বাংলাদেশের জন্ম। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সেবা দানের নিমিত্তে সংস্থাটির যাত্রা। তবে সরাসরি খ্রিস্টান মিশনারী কাজই তাদের মূল কর্মসূচী। ঢাকার আটকে পড়া পাকিস্তানী শরণার্থী ক্যাম্প, মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, সুন্দরবন এলাকায় হিড বাংলাদেশ বিশেষভাবে কাজ করছে। স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, গণশিক্ষা স্কুল, হ্যান্ডিক্রাফট কেন্দ্র, হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস খামার, গরু-ছাগলের খামার প্রভৃতি প্রকল্পে তারা বিনিয়োগ করে থাকে। এনজিও ব্যুরো অবশ্য হিড বাংলাদেশকে ধর্মীয় মিশনারী সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছে[২৩]।

www.pathagar.com

ম্যানোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি (Manonite Central Committee - MCC) : ম্যানোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি একটি খ্রিস্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান। তবে এনজিও হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এটি আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মসূচী পালন করছে। সৈয়দপুরের বিহারী ক্যাম্পে ম্যানোনাইট সেন্ট্রাল কমিটির ধর্মান্তর কার্যক্রম কিছুদিন আগে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। নীলফামারী জেলা প্রশাসক তদন্ত করে বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। সৈয়দপুর ছাড়াও, বরিশাল, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, ফেনী, নোয়াখালীতে এম সি সি'র প্রজেক্ট অফিসের মাধ্যমে কাজ আছে। প্রধান কার্যালয় ঢাকার মোহাম্মদপুরে। উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের একটি গীর্জা সংগঠন হলো 'মেনোনাইট চার্চ'। আর মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি এই চার্চ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। চার্চ গ্রুপ 'এম সি সি' এর মাধ্যমে তাদের সাহায্য বিতরন করে। এই সংস্থার পোগান হচ্ছে, A Christian resource for meeting human need. এম সি সি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এবং বাংলাদেশে ১৯৭২ সাল থেকে কাজ করছে। প্রায় ৩৫ টিরও বেশী দেশে সংস্থাটি শিল্প, চিকিৎসা, কৃষি এবং কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে সাহায্য দিয়ে থাকে[২৪]।

দ্বীপশিখা : সংস্থার নামটি নিরেট বাঙালী হলেও এটি হল্যান্ড ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম ফর রিকন্সসিলেশন সংক্ষেপে 'আইফর' নামক সংস্থার বাংলাদেশী নাম। বাংলাদেশে এর প্রধান কার্যালয় ঢাকার মিরপুরে। দ্বীপশিখার কার্যক্রম সাধারণতঃ দিনাজপুর জেলার সাঁওতালদের মাঝে। দিনাজপুরের সুইহারিতে আঞ্চলিক অফিস এবং বিরল, বীরগঞ্জ, ঘোড়াঘাটে তাদের প্রকল্প অফিস আছে। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গ্রাম উন্নয়ন, হস্তশিল্প, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non formal education), প্রভৃতি কাজ তারা করছে[২৫]। পাশাপাশি ধর্মীয় কর্মসূচী রয়েছে সব কিছুর উপরে অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে।

লুথারান মিশনসমূহ

বাংলাদেশ লুথারান মিশন (ফিন্নিস) : ফিনল্যান্ডের অর্থ সাহায্যে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ লুথারান মিশন নামক মিশনারী সংস্থাটি। বাংলাদেশে এর প্রধান কার্যালয় নওগাঁয়। বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এটি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি আবাসিক। ধর্মান্তরের অভিযোগে এই সংস্থার কার্যক্রম বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার। কিন্তু ফিনল্যান্ডের উন্নয়ন সহযোগিতা মন্ত্রীর বিশেষ হস্তক্ষেপের ফলে সরকারী উদ্যোগ আর অগ্রসর হয়নি, তারা এ দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ লুথারান মিশন (নরওয়েজিয়ান) : এটি নরওয়ের সাহায্যপুষ্ট খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থা। এই সংস্থা বিশেষভাবে কাজ করে নবাবগঞ্জ জেলার আমনুরায়। নরওয়েজিয়ান লুথারেন মিশনের হেড অফিস ঢাকার বনানীতে।

বাংলাদেশ লুথারান মিশন (ডেনিশ) : ডেনমার্কের অর্থ সাহায্যে এই সংস্থা বাংলাদেশে মিশনারী কাজ পরিচালনা করছে। এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন নিয়েই অবশ্য এই খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থাটি তাদের কাজ পরিচালনা করছে। ডেনিশ লুথারান মিশনের প্রধান কার্য এলাকা দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জে। ঢাকার ধানমন্ডীতে এটির প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

নর্দাণ এ্যাংলিকান লুথারান চার্চ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (Bangladesh Northern Ev Engelical Lutheran Church Development Foundation -BNELC-DF) : নর্দাণ এভ এ্যাংলিকাল লুথারান চার্চ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন একটি খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থা। সমাজের অনগ্রসর অংশের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচী পালন করছে সংস্থাটি। দিনাজপুরের সাঁওতালদের মাঝেই তারা বেশী কর্মতৎপর। দিনাজপুরে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেছে সাঁওতাল শিক্ষা কেন্দ্র। গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জের আদমপুর মিশনে একটি মেডিকেল পরিচালনা করে। দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে রয়েছে এর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। ইনজেলিক্যাল লুথারান চার্চ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সদর দফতর দিনাজপুরের ঈদগাহ আবাসিক এলাকায়। ঢাকার মোহাম্মদপুরে রয়েছে এর লিয়াঁজো অফিস[২৬]।

ওয়াচ টাওয়ার বাইবেল সোসাইটি

ওয়াচ টাওয়ার বাইবেল সোসাইটি (Watch Tower Bible Tract Society) একটি খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থা। এই সংস্থার বাংলা মুখপাত্র 'পাক্ষিক প্রহরী দূর্গ' ভারত থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রতিসংখ্যায় লেখা থাকে, 'প্রতি সংখ্যার ছাপার গড় ২ কোটি ২৩ লক্ষ ২৮ হাজার বাংলায় প্রকাশিত হয়'। এই সংখ্যা যদি প্রকৃত হয়, তাহলে ওয়াচ টাওয়ার নামক খ্রিস্টান সংস্থাটির নেটওয়ার্ক যে ব্যাপক তাতে কোন সন্দেহ থাকেনা। ওয়াচ টাওয়ারের উদ্দেশ্য, *যিহোবা ঈশ্বর*[২৭] কে নিখিল বিশ্বের সার্বভৌম প্রভূরূপে মহিমান্বিত করা'[২৮]। ওয়াচ টাওয়ার কর্তৃক প্রকাশিত ধর্মীয় পুস্তিকার কয়েকটি নিম্নরূপঃ

(১) বিষন্নদের জন্য সান্তনা
(২) এই জগৎ কি রক্ষা পাবে

www.pathagar.com

(৩) কে প্রকৃতপক্ষে জগৎকে শাসন করেন
(৪) পারিবারিক জীবন উপভোগ করুন ইত্যাদি।
ওয়াচ টাওয়ারের বাংলাদেশ অফিস ঢাকার ফার্মগেটে। এর একমাত্র আঞ্চলিক অফিসটি চট্টগ্রামে[২৯]।

চার্চ অব বাংলাদেশ সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

এই সংস্থা একাধারে ধর্মীয় ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মেহেরপুর জেলার সদর থানা ও গাংনী, কেদারগঞ্জ, শ্রীরতনপুর, বরিশাল, যশোর, রাজশাহী, টাঙ্গাইলে চার্চ অব বাংলাদেশের কাজ আছে। সংস্থা যশোরের বকুল তলায় চালায় একটি ট্রেড স্কুল, নাম ক্রিস্ট চার্চ ট্রেড স্কুল। রাজশাহীর কোর্টে সংস্থার স্কুলসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মসীহী জামাত

মসীহী জামাত সম্পূর্ণই খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ইসা মসীহকে তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য। মুসলমানদের বিভিন্ন পরিভাষা যেমন, আল্লাহ, নবী, নামাজ, কালেমা, নাজাত ইত্যাদি ব্যবহার করে মসীহী জামাত বাংলা ভাষায় বিরাট এক খ্রিস্টীয় সাহিত্য সৃষ্টি করেছে। মাসিক 'আলোর ফোয়ারা' পত্রিকাটি মসীহী জামাতের একটি বাংলা মুখপত্র। মসীহী জামাত প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তিকা হলো ঃ

(১) ত্রিত্ব পাকের মাঝে আল্লাহ এক
(২) আমরা কিভাবে প্রার্থনা করি
(৩) ইঞ্জিল ও কোরানে ঈসা কালেমাতুল্লাহর ব্যক্তিসত্ত্বা
(৪) 'তওরাত ও ইঞ্জিল শরীফের অভ্রান্ততা' ইত্যাদি ১৯টি গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে।

তাছাড়াও মসীহী জামাত তাদের মতাদর্শ প্রচারের জন্য ২৫টি অডিও ক্যাসেট সম্পাদনা করেছে। মসীহী জামাতের ২টি শাখা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যথাঃ (এক) কল অব হোপ, চান্দ মোহাম্মদ রোড, কুষ্টিয়া। (দুই) বাইবেল ট্রেনিং সেন্টার, পুলহাট, দিনাজপুর। মসীহী জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকার মোহাম্মদপুরে।

অক্সফাম (OXFAM)

১৯৪২ সালে অক্সফোর্ডের কিছু সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়েছিল একটি মহৎ উদ্দেশ্যে। আর তা হলো গ্রীসের ক্ষুধার্ত শিশুদের জন্য খাবার পাঠাবার ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করা। সেই থেকে অক্সফামের যাত্রা শুর। প্রথম দিকে সংস্থা গ্রীসেই তাদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখে। ১৯৪৫ সালে অক্সফাম ইউরোপে বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত জার্মানীতে তাদের কর্মকান্ড সম্প্রসারিত করে। ১৯৪৮ সালে আফ্রিকা, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকায় তাদের কর্মসূচী সম্প্রসারিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও বেলজিয়ামেও অক্সফামের শাখা আছে। এটির সদর দপ্তর অক্সফোর্ডে। অক্সফামের তহবিল বৃদ্ধি নির্ভর করে সাধারণ মানুষের উদ্যোগ ও সদিচছার উপর[৩০]। তৃতীয় বিশ্বের একটি দারিদ্র-পীড়িত দেশ হিসেবে বাংলাদেশও অক্সফামের কর্মপরিধির আওতায় আছে। অক্সফামের বাংলাদেশ প্রতিনিধির অফিস ঢাকার মোহাম্মদপুরে[৩১]।

কারিতাস

কারিতাস ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ ভালবাসা, প্রেম বা দয়ার কাজ। কারিতাস বাংলাদেশ ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মযাজক প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত একটি স্বেচছাসেবী সংস্থা। তবে কারিতাস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৭ সালে জার্মানীতে। পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কারিতাস প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । ১৯৬৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী তদানীন্তন পাকিস্তানে কারিতাস প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ১১৯টি দেশে কারিতাস সার্বিক মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচেছ।

বাংলাদেশে কারিতাস : বাংলাদেশে কারিতাস গঠনের প্রেক্ষাপট অবশ্যই মানবিক ছিল। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে যে ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড় ও জলোচছাস আঘাত হানে তাতে মানবিক ত্রাণ কাজে এগিয়ে আসে দেশী বিদেশী সংস্থাসমূহ। খ্রিস্টান মিশনারীরাও এসময় এগিয়ে আসেন সহযোগিতার হাত নিয়ে। ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) কে ৪টি ধর্ম প্রদেশে বিভক্ত করে ৪ জন বিপশের অধীনে খ্রিস্টধর্ম চর্চা ও প্রচার করতেন। উপকূলীয় দুর্যোগের সময় চট্টগ্রাম ক্যাথলিক ধর্ম প্রদেশ ত্রাণ কাজের জন্য গঠন করে কোর্ড (Chittagong Organization for Relief and Development সংক্ষেপে CORD)। সারা বিশ্বে বাংলাদেশের দুর্যোগের খবর ছড়িয়ে পড়ার কারণে অনেকেই ত্রাণ নিয়ে এদেশে আসেন। 'কারিতাস', সুইজারল্যান্ডের প্রতিনিধি কর্ণেল এফ স্টারম্যান এদেশে এসে এক লক্ষ সুইস ফ্রাংক বিশপদের ত্রাণ তহবিলে দান করেন। কিছুদিন পর পোপ ৬ষ্ঠ জন পল তার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফরের সময় স্বল্প সময়ের জন্য ঢাকা বিমান বন্দরে যাত্রাবিরতি করেন এবং সে সময় তিনিও ত্রাণ কাজের জন্য একলক্ষ মার্কিন ডলার দান করেন। এ সমস্ত অর্থে গঠিত হয় কোর (Christian Organization

www.pathagar.com

for Relief and Reconstruction সংক্ষেপে CORR)। ৪টি ধর্ম প্রদেশের ৪ জন বিশপও 'কোর' এর তহবিলে এক লক্ষ টাকা করে দান করেন। প্রথমে কোর এর কার্যক্রম ঢাকার পূর্বানী বিল্ডিং-এ ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিসের অফিস থেকেই পরিচালিত হত। পরে ২৩, ইস্কাটনে (ঢাকা) ভাড়া বাড়িতে আলাদা অফিস ও ১৯৭৬ সালে ২, আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকায় নিজস্ব ভবনে কোর এর অফিস স্থানান্তরিত হয়। সে সময় নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে 'কারিতাস বাংলাদেশ' নামে এটি যাত্রা শুরু করে। ৪ জন বিশপকে নিয়ে গঠিত জেনারেল বডি কারিতাস পরিচালনা করে। এটি বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ডি এস ডব্লিউ/এফডিও/আর-০০৯ এবং সোসাইটি এ্যাক্ট ১৮১০ এর XX। ৩৭৬০-বি/১১ এর মাধ্যমে ১৯৭২-৭৩ সালে রেজিস্ট্রিকৃত[৩২]।

কারিতাস বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয় ঢাকার শান্তিবাগে। তা ছাড়াও বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকার পল্লবী (মিরপুর), দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী- এই ছয়টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তথ্যে জানা যায়, কারিতাস এদেশের ৪২ টি জেলার প্রায় ৫৭৮১ টি গ্রামের মানুষের মাঝে কাজ করছে[৩৩]।

কারিতাস এর কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো[৩৪]
সাধারণ পরিষদ (ক্যাথলিক বিপশদের নিয়ে গঠিত)
কার্যকরী পরিষদ
কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা (নির্বাহী পরিচালক)
উন্নয়ন পরিচালক, কল্যাণ পরিচালক, শিক্ষা পরিচালক, প্রশাসনিক পরিচালক।

কারিতাস- রাজশাহী অঞ্চল : কারিতাস এর রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহী নগরীর মহিষবাথানে অবস্থিত। শহরের কোলাহল থেকে দুরে বিস্তৃত জায়গায় প্রায় ৩৪ জন কর্মকর্তা -কর্মচারী নিয়ে কারিতাসের রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়। রাজশাহী অঞ্চলে কারিতাস রাজশাহী জেলার পবা, পুঁঠিয়া, গোদাগাড়ী, তানোর, বাঘা, বাগমারা, নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম, নওগাঁর ধামইরহাট, পত্নীতলা, নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার, নবাবগঞ্জের নাচোল, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, পাবনার চাটমোহর, সিরাজগঞ্জের সদর থানা ও কাজীপুর, বেলকুচি, তাড়াশ, চৌহালী, বগুড়ার শিবগঞ্জ থানার মোট ১০৫টি ইউনিয়নের ১৩০১ টি গ্রামে কারিতাস কাজ করছে। এই এলাকার ২ লাখ ২১ হাজার ৬৫৫ জন মানুষ কারিতাসের বিভিন্ন প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন- যাদের মধ্যে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৪৫ জনই মহিলা আর পুরুষ মাত্র ৬০ হাজার ৯০০ জন[৩৫]।

www.pathagar.com

রাজশাহীর আদিবাসীদের মাঝে মিশনারীদের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম

বাংলাদেশে খ্রিস্টান ধর্মের সব কটি সম্প্রদায়ের তৎপরতা আছে এবং রাজশাহী জেলায়ও খ্রিস্টান সমাজের প্রায় সব কটি সম্প্রদায়েরই কমবেশী ভূমিকা রয়েছে। ইতিপূর্বে খ্রিস্টান সমাজ রাজশাহীতে শুধুমাত্র যীশুর বাণী প্রচার করতেন। মিশনারীরা 'মহান যীশুর ত্যাগ ও ক্ষমার মহান বাণী'কে তুলে ধরতেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে খ্রিস্টান সমাজ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবাধর্মী কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করছে।

বরেন্দ্র অঞ্চল-রাজশাহীতে মিশনারীরা প্রথমে বাইবেলের শিক্ষা প্রচারে এলেও এখন তারা নানামুখী সেবাধর্মী ও অর্থলগ্নীকারী তৎপরতায় নিয়োজিত আছে। রাজশাহী জেলায় ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান সম্প্রদায় বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

ক্যাথলিক চার্চের কার্যক্রম

রাজশাহী জেলায় ক্যাথলিক মিশনারীরা শেষে আগমন করলেও কর্মতৎপরতার দিক থেকে এই জেলায় তাদের প্রাধান্য বেশী। রাজশাহীতে ক্যাথলিক চার্চ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নরূপঃ

১. কারিতাস, মহিষবাথান, রাজশাহী।
২. আশাদান (মাদার তেরেসা আশ্রম) এতিমখানা, মহিষবাথান, রাজশাহী।
৩. সিক সেন্টার (হাসপাতাল), ডিঙ্গাডোবা মিশন ক্যাম্পাস।
৪. টি বি সেন্টার (যক্ষা চিকিৎসা কেন্দ্র), ডিঙ্গাডোবা মিশন ক্যাম্পাস, রাজশাহী।
৫. কাপিতানিও স্কুল (কিন্ডারগার্ডেন স্কুল), ডিঙ্গাডোবা, রাজশাহী।
৬. মুক্তিদাতা বেসরকারী জুনিয়র হাইস্কুল, হড়গ্রাম পূর্ব বাগানপাড়া, রাজশাহী।
৭. ছাত্র হোস্টেল, পূর্ব আলীগঞ্জ, হড়গ্রাম, রাজশাহী।
৮. ৬টি আবাসিক এলাকা।
৯. ২৭ টি চার্চ এবং
১০. কবরস্থান ঃ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের রাজশাহীর কবরস্থান রাজশাহীর হড়গ্রাম ইউনিয়নের আলীগঞ্জে। কবরস্থানটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। কবরস্থান সংলগ্ন আছে এর দেখাশুনার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির বাসভবন।

www.pathagar.com

আবাসিক এলাকা

ক্যাথলিক চার্চের রাজশাহী ধর্ম প্রদেশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় শুধুমাত্র রাজশাহী সদরেই বেশ কয়েকটি আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা হয়েছে। রাজপাড়া থানার অধীন হড়গ্রাম ইউনিয়নের ৬ টি খ্রিস্টান পল্লীতে প্রায় ২০০টি পরিবার বসবাস করে। খ্রিস্টান পল্লীগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হলোঃ

পশ্চিম টালীপাড়া, হড়গ্রাম, রাজশাহী ঃ এই পল্লীটি সম্পূর্ণ মিশনের ক্রয় করা জমিতে গড়ে উঠেছে এবং এখানে বরেন্দ্র এলাকার আদিবাসীরা যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে তারা সপরিবারে বসবাস করছে। এখানে ৪২ টি পরিবার বাস করে। এরা সবাই আদিবাসী এবং ধর্মান্তরিত ক্যাথলিক খ্রিস্টান। প্রত্যেক পরিবারের জন্য দু' কামরার ঘর, একটি করে পাকা পায়খানা এবং প্রতি ৪টি পরিবারের জন্য একটি করে নলকূপ দেয়া হয়েছে। পল্লীটির জমির মালিকানা এবং ঘর-বাড়ি মিশনের। রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের গরীব দুস্থ এবং ভুমিহীন আদিবাসীদের এখানে থাকার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। প্রাচীর ঘেরা পশ্চিম টালীপাড়ায় একটি মাত্র গেট দিয়ে প্রবেশ - বাহির হতে হয়। পল্লীটি নিরাপদ এবং শান্ত।

পূর্ব টালীপাড়া, হড়গ্রাম, রাজশাহী ঃ পশ্চিম টালীপাড়ার প্রাচীরের পূর্ব পার্শ্বেই বেশ কিছু পাকা দালান বাড়ি চোখে পড়ে। এটিই পূর্ব টালীপাড়া। এই পাড়াটি দেখে তাদের আধুনিক জীবন ও স্বচ্ছলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারিতাসসহ বিভিন্ন খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী অফিসে যে সকল আদিবাসী খ্রিস্টান চাকুরী করেন তারা এই পাড়াটি গড়ে তুলে বসবাস করছেন। এখানে ১৯টি খ্রিস্টান পরিবার বাস করেন। এখানকার জমি প্রথমে মিশন কিনে নিয়ে তা প্লট আকারে কিস্তিতে তাদের দিয়েছে। বসবাসকারী খ্রিস্টান আদিবাসীরা নিজ খরচে নিজস্ব রুচি, সামর্থ ও ডিজাইন মত বাড়ি করে নিয়েছে। কিস্তির টাকা পরিশোধ হয়ে গেলে জমিসহ বাড়ির মালিকানা তারা পাবেন।

আলীগঞ্জ, হড়গ্রাম, রাজশাহী ঃ পূর্ব টালীপাড়ার খ্রিস্টান পল্লীর একটু পূর্বে এবং পূর্ব আলীগঞ্জ এর উত্তরে ক্যাথলিক কবরস্থানের পিছনে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি আদিবাসী পরিবার বাস করেন। আশে পাশে অবশ্য মুসলমানদের বসবাস। এখানে ৭টি পরিবার বাস করেন যাদের সবাই ক্যাথলিক খ্রিস্টান। এই পরিবারগুলির জন্য মিশন শুধুমাত্র জমি কিনে দিয়েছে। সীমানা প্রাচীর ও ঘরবাড়ি এখনো করে দেয়নি। বসবাসকারীরা নিজেরাই মাটির কিংবা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘর তুলে নিয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা সবাই আন্ধারকোঠা হতে রাজশাহীতে এসেছে। এই পল্লীতে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছেনি।

www.pathagar.com

আলীগঞ্জ পশ্চিম পাড়া, হড়গ্রাম, রাজশাহী ঃ হড়গ্রাম ইউনিয়নের আলীগঞ্জ একটি বড় এলাকা। এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করে। তবে স্থানে স্থানে কয়েকটি খ্রিস্টান পল্লী গড়ে ওঠায় এলাকাটি একটি ভিন্ন পরিচয় পেয়েছে। আলীগঞ্জ পশ্চিম পাড়া এর একটি খ্রিস্টান পল্লী। এখানে রয়েছে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ২৫টি পরিবারের বাস। তারা সবাই আদিবাসী। সাঁওতাল, ওঁরাও, মুর্ম্মু ইত্যাদি গোত্রের লোকজনই এখানে বেশী বাস করে। এই পাড়ার জমি মিশনের। বসবাসকারীরা মিশনের নিকট থেকে কিস্তিতে প্লট কিনে নিয়েছেন এবং পছন্দ ও সামর্থ অনুযায়ী ঘরবাড়ি তৈরী করে তারা বাস করছেন।

আলীগঞ্জ পূর্ব পাড়া, হড়গ্রাম, রাজশাহী : আলীগঞ্জ পূর্ব পাড়ায় বাস করে ২২টি খ্রিস্টান পরিবার এবং তারা সবাই সামর্থবান। তারা মিশনের কেনা জমি প্লট আকারে কিনে নিয়েছেন এবং নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বাড়ি তৈরী করে বসবাস করছেন। এই পল্লীতে বসবাসকারী সবাই ক্যাথলিক নন। ২২টি পরিবারের মধ্যে ক্যাথলিক মাত্র ৩টি। বাকীরা সবাই প্রটেস্ট্যান্ট। তারা মিলেমিশে বসবাস করেন। এখানকার অধিবাসীদের অনেকেই বিভিন্ন অফিসে সম্মানজনক পদে চাকুরী করছেন।

হড়গ্রাম পূর্ব বাগান পাড়া, রাজশাহী ঃ আদিবাসীদের জন্য মিশনের আবাসিক ব্যবস্থার একটি বড় নিদর্শন হড়গ্রাম পূর্ব বাগান পাড়া খ্রিস্টান পল্লী। একটি বিশাল বাগানে পরিকল্পিতভাবে সারি সারি ঘর তৈরী করে তাতে ভূমিহীন আদিবাসীদের বসবাসের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। এই বাগান পাড়ায় ৮৪টি পরিবার বাস করেন। ঘর গুলি ইট দিয়ে তৈরী, টিনের একচালা। দু'কক্ষ বিশিষ্ট একেকটি ঘরের সাথে পায়খানা নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। বাগান পাড়ার পল্লীতে বিদ্যুৎ এবং নলকুপের পানির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। ৮৪টি পরিবারের ২/১টি পরিবার ছাড়া সবাই আদিবাসী এবং সবাই ক্যাথলিক খ্রিস্টান। প্রাচীর ঘেরা এই পল্লীর ভেতরে রয়েছে আদিবাসীদের সন্তানদের জন্য স্কুল- 'মুক্তিদাতা বেসরকারী জুনিয়র হাইস্কুল'।

রাজশাহী জেলায় খ্রিস্টান মিশনারীদের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম ব্যাপক ও বিস্তৃত। গবেষণায় শুধুমাত্র ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের একটি (কারিতাস) ও প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের একটি (চার্চ অব বাংলাদেশ) প্রতিষ্ঠানের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলোঃ

কারিতাসের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ক্যাথলিক চার্চের একটি প্রতিষ্ঠান হলো কারিতাস। এটি দু' ধরনের প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক কার্যক্রম

www.pathagar.com

পরিচালনা করে থাকে। যথা ঃ *এক.* সার্বিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম এবং *দুই.* তাৎক্ষনিক উন্নয়নের জন্য ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কার্যক্রম বা জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম। নিম্নে এই দু'ধরনের কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

শিক্ষা কার্যক্রম : গ্রাম বাংলার নির্যাতিত, দুঃস্থ, অসহায় মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে কারিতাস শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে। এজন্য কারিতাসের রয়েছে উন্নয়ন সম্প্রসারণ শিক্ষা কার্যক্রম। সংস্থার টার্গেট গ্রুপ (যারা কারিতাসের কার্যক্রমের আওতায় এসেছে, তাদের) কে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সচেতন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৭৯ সালে দেশের ২৪ টি থানায় এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ লোক এর আওতায় এসেছে।

শিশুদের স্কুলমুখী করার জন্য কারিতাসের রয়েছে শিশু স্কুলমুখীকরণ প্রকল্প। নিম্ন শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা, যারা নিজেদের হীন মনে করে নিকটে স্কুল থাকা সত্ত্বেও পড়তে যায় না, তাদের স্কুলে নেয়াই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। যেখানে স্কুল নেই সেখানে স্কুল করা, শিশু ও অভিভাবকদের শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন করাও এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনের জন্য কারিতাসের রয়েছে 'ফরমাল এডুকেশন প্রোগ্রাম'। এ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কারিতাস পরিবেশ ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিশুদের জন্য কার্যকর একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্ঠা করছে। তাছাড়াও কারিতাসের নিজস্ব কর্মী ও সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছে কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (C.D.I) এবং প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা সেল (TERC) বাংলায় ও ইংরেজীতে নিউজ লেটার, রিপোর্ট, পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদি কাজ কারিতাস করে থাকে।

কারিগরী ও মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ কারিগরি ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিতাস বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে। যেমন:

মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল (MAWTS) ঃ ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত ও তৈরীর জন্য একটি কারখানা এবং কৃষি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ স্কুল আছে। এখানে কৃষি ও সেচের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল উদ্ভাবন

www.pathagar.com

করা হয়। যেমন - রোয়ার পাম্প (Rower Pump) বীজ-বপন যন্ত্র (Seed Drillers) উন্নতমানের লাঙ্গল, মই ইত্যাদি। তাছাড়া এখানে তিন বছরের দীর্ঘ মেয়াদী এবং ৬ মাসের স্বল্প মেয়াদী কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসে রয়েছে কৃষি কারিগরী কারখানা। ১৭ জন কর্মকর্তা- কর্মচারী এ কারখানায় কাজ করে।

কারিগরী বিদ্যালয় (Trades Schools) : গরীব ও বেকার যুবকদের কাঠ মিস্ত্রী, ইলেকট্রিশিয়ান, কারিগর (মেকানিক, সেলাই, হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, বাশ-বেঁতের কাজ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে ৫ মাস ও ১ বৎসর মেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের অর্থ উপার্জনক্ষম করে তোলা ও তাদের জীবনমান উন্নত করতে সহায়তা করার জন্য এ প্রকল্প। এ পর্যন্ত সারা দেশে ২৩ টি কারিগরী স্কুল কারিতাস প্রতিষ্ঠা করেছে, যার একটি রয়েছে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম থানায়। স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের আরো একুশ টি স্কুল কারিতাসের উন্নয়ন এলাকাধীন বিভিন্ন থানায় ভ্রাম্যমানভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। রাজশাহী অঞ্চলে কারিতাসের এমন ২টি ভ্রাম্যমান স্কুল আছে[৩৬]। বান্দরবন জেলায় রয়েছে একটি স্কুল নাম বান্দরবন কাঠমিস্ত্রী (কার্পেন্টি) স্কুল।

আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প : পুকুরে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষ, মিনি হ্যাচারী স্থাপন করে উৎকৃষ্ট মানের পোনামাছ উৎপাদন, গরু মোটা তাজাকরণ, হাঁস-মুরগী পালন, ছাগল পালন, খামার গড়ে তোলা, সবজি চাষ করা ইত্যাদি কাজে কারিতাস দরিদ্র জনগণকে সহায়তা দিয়ে যাচেছ। পুরুষ ও মহিলাদের সমিতির মাধ্যমে এসব ক্ষেত্রে ঋণও দেয়া হয়। এছাড়া রয়েছে রেশম চাষ ও সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম। মহিলাদের জন্য কারিতাসের হস্ত শিল্প প্রকল্প 'কোর- দি জুট ওয়ার্কস'। পাটজাত দ্রব্য তৈরীর জন্য এই প্রকল্পে ৬৩৩০ জন মহিলা নিয়োজিত এবং তারা বছরে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার মূল্যের পাটের কাজ বিদেশে রপ্তানী করে থাকে।

স্বাস্থ্য সেবা : কারিতাস দেশের স্বাস্থ্য খাতে সেবা প্রদান করছে। গ্রামীন দরিদ্র রোগী সচরাচর শহরে চিকিৎসার ব্যাপারে তেমন সুবিধা করতে পারেনা হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকের দালালদের জন্য । এমন রোগীদের জন্য কারিতাসের রয়েছে সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা। কারিতাস স্থাপন করেছে রোগী আশ্রয় কেন্দ্র। দরিদ্র রোগীরা এর মাধ্যমে শহরের হাসপাতালের সুবিধা পায়। এখানকার কর্মীরা রোগীদের বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যায় ও অন্যান্য সহযোগিতা করে। খরচাদির কিছু অংশ রোগীর সামর্থ অনুযায়ী নির্বাহ হয়ে থাকে। রাজশাহী ও ময়মনসিংহে এরূপ ২টি কেন্দ্র কাজ করছে। স্বাস্থ্য সেবায় কারিতাসের আরেকটি প্রকল্প হলো কুষ্ঠ, টিবি (যক্ষা) রোগ

www.pathagar.com

প্রতিরোধ কর্মসূচী। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণকে যক্ষা, কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে সচেতন করা হয়। কেন্দ্রে আগত আপামর জনসাধারণকে কারিতাসের স্বাস্থ্যকর্মী এ বিষয়ে বোঝান। বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, শাক-শবজী বেশী ভক্ষণ, প্রচুর পরিমানে পানি পান করা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। ধানজুড়িতে অবস্থিত কুষ্ঠরোগ কেন্দ্রে কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসা ও তাদের পুনর্বাসন করা হয়।

পরিবার পরিকল্পনা খাতে কারিতাসের রয়েছে প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প। বিভিন্ন সম্মেলন, গ্রুপ বা কর্মশালার মাধ্যমে এবং মাঠ কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দম্পতিদের প্রাকৃতিক উপায়ে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করে।

কারিতাসের উদ্যোগে দাতব্য চিকিৎসা সেবাও পরিচালিত হয়ে থাকে। গ্রামীণ দাতব্য চিকিৎসালয়গুলোতে কারিতাস বাৎসরিক কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকে।

পানীয় জল ও পয়:প্রণালী খাতে কারিতাসের অবদান কম নয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে টিউবওয়েল ও বরেন্দ্র অঞ্চলে তারাপাম্প বসিয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। স্বল্প মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করাও তাদের কর্মসূচীর অর্ন্তভূক্ত। এসব খরচের অংশ বিশেষ (২০-২৫%) অবশ্য জনগণকে বহন করতে হয়।

কারিতাস অন্ধত্ব মোচনে বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে কাজ করে। সমিতিকে ৮টি হাসপাতাল নির্মাণ, পরিচালনা, চক্ষু শিবির, স্কুল ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা, চক্ষুরোগ চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ব্যাপারে সহায়তা করে।

মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য কারিতাসের প্রকল্প রয়েছে। বিশেষভাবে মা ও শিশুর যত্ন, পুষ্টিজ্ঞান ও টিকাদান এ প্রকল্পের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে অঙ্গহীন রোগীদের কৃত্তিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজনের জন্য কারিতাসের রয়েছে কৃত্রিম অঙ্গ প্রতঙ্গ সংযোজন প্রকল্প। এটি রাজশাহীতে কারিতাসের নিজস্ব অফিসে অবস্থিত। এখানে একজন বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান এগুলি তৈরী করে রোগীদের সরবরাহ করে।

মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুর্নবাসনের জন্য কারিতাসের আবাসিক কেন্দ্র রয়েছে। এখানে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও তাদের মাদক দ্রব্য সেবনে বিরত রাখা ও পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। অনাবাসিক মাদকাসক্তদেরও এখানে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়।

www.pathagar.com

অন্যান্য সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম : কারিতাসের রয়েছে এতিমখানা প্রকল্প। এতিম শিশুদের জন্য প্রকল্প নির্মাণ, খাদ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কারিতাস সহায়তা করে। আর উৎপাদনকারী প্রকল্প ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এতিমখানাগুলোকে স্বনির্ভর হতে সহায়তা করে। এতিমখানা পরিচালকদের জন্য বাসস্থান, তাদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া এই সংস্থা এতিম শিশুদেরকে পারিবারিক পরিবেশে বড় হওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিবারে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে।

উপরন্তু, আকস্মিক, প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বাড়িঘর তৈরী, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ইত্যাদির মাধ্যমে করিতাস দরিদ্র জনসাধারণকে তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা করে।

প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের কার্যক্রম

প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের মধ্যে রাজশাহীতে চার্চ অব বাংলাদেশ এর অনুসারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। লুথারান কিংবা ব্যাপ্টিস্টদের সংখ্যা একেবারেই নগন্য। তাই প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে চার্চ অব বাংলাদেশের কর্মকান্ড এখানে তুলে ধরা হলোঃ

রাজশাহী জেলায় চার্চ অব বাংলাদেশ পরিচালিত অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে। যথা ঃ-

১. খ্রিস্টান মিশন হাসপাতাল
২. ডাঃ এলিজাবেথ কনান মেমোরিয়াল নার্সিং ইনস্টিটিউট
৩. মিশন বালিকা বিদ্যালয়
৪. সান্তাল (সাঁওতাল) মিশন
৫. ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল
৬. রাজশাহী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প
৭. রাজশাহী সিটি চার্চ।

খ্রিস্টান মিশন হাসপাতাল

সেবার ক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারীদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'খ্রিস্টিয়ান মিশন হাসপাতাল, রাজশাহী'। এটি নগরীর রাজপাড়া থানার মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশে এ রকম আরও বেশ কয়েকটি হাসপাতাল চার্চ অব বাংলাদেশ মিশন পরিচালনা করে[৩৭]। ১৮৮৭ সালে ইংরেজ প্রেসবিটারিয়ান মিশনারীরা এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করেন[৩৮]। তখন এটি ছিল নওগাঁ জেলায় মাত্র ৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল। ১৮৯০ সালে ডাঃ আই টি প্যাট্রিক এই হাসপাতালটিকে ১২ শয্যায় উন্নীত করে

www.pathagar.com

রাজশাহীতে স্থানান্তর করেন। বর্তমান স্থানে ১৯৫০ সালে হাসপাতালটি পুনস্থানান্তরিত হয়। সে সময় হাসপাতালটির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন *ডাঃ এলিজাবেথ কনান* নামক এক মহিলা মিশনারী। যিনি তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি বছর এই হাসপাতালে কাজ করেছেন। ১৯৫৭ সালে যখন ডাঃ উপেন্দ্র নাথ মালাকার মেডিকেল সুপার, তখন এটি ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত হয় এবং ১৯৭৪ সালে নরওয়ে চার্চের অর্থানুকুল্যে ২০ শয্যা বিশিষ্ট শিশু বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে হাসপাতালটি ১২০ শয্যা বিশিষ্ট। এই হাসপাতালের মাধ্যমে উত্তর বঙ্গের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আর্ত মানুষেরা সেবা পাচ্ছে।

বর্তমানে মিশন হাসপাতালটি পরিচালনা করে চার্চ অব বাংলাদেশ। চার্চ অব বাংলাদেশের প্রধান মডারেটর ও ঢাকার বিশপ হাসপাতালটির চেয়ারম্যান এবং কুষ্টিয়া ডায়োসিস প্রধান হলেন পরিচালনা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান।

ডাঃ এলিজাবেথ কনান মেমোরিয়াল নার্সিং ইনস্টিটিউট

চার্চ অব বাংলাদেশ পরিচালিত অন্যতম একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ডাঃ এলিজাবেথ কনান মেমোরিয়াল নার্সিং ইনস্টিটিউট। ডাঃ এলিজাবেথ কনান পঞ্চাশের দশকে এদেশে একজন ইংরেজ মিশনারী হিসেবে রাজশাহীর খ্রীস্টিয়ান মিশন হাসপাতালে কাজ করেছেন। তিনি এবং তার পরবর্তীতে দায়িত্ব পালনরত ডাঃ উপেন্দ্র নাথ মালাকার ও মিসেস মিনা মালাকার ১৯৫৮ সালে মিশন হাসপাতালে জুনিয়র নার্সিং কোর্স চালু করেন[৩৯]। পরবর্তীতে ডাঃ উপেন্দ্র নাথ মালাকারের প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সিনিয়র নার্সিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের অধীনে। সে বছর মাত্র ৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। নরওয়েজিয়ান উইমেন্স এসোসিয়েশন, নরওয়ে ও সাহায্য সংস্থা নোরাড (NORAD) এর সাহায্যার্থে ১৯৮০ সালে ইনস্টিটিউটের ভবন ও নার্সদের হোস্টেল নির্মাণ করা হয়। এখনও নরওয়ের উইমেন্স এসোসিয়েশন এই ইনস্টিটিউটের ১৫ জন শিক্ষার্থীর খরচ বহন করে আসছে।

১৯৮৪ সালে ডাঃ উপেন্দ্র নাথ মালাকার মিশন হাসপাতাল ছেড়ে গেলে চার্চ অব বাংলাদেশ এর মডারেটর রাইট বেভারেন্ট বার্ণবা দ্বিজেন মন্ডল নার্সিং ইনস্টিটিউটকে দেখাশুনা করেন। অতপর ১৯৮৫ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত এটি পরিচালনা করেন জাপানের নর্থ কানতো ডায়োসিস থেকে আগত মিশনারী মিস ইকু কোহারাজাওয়া, তাকে সবাই *'মিস্টার ফ্রান্সিস্কো'* বলে ডাকতেন।। ১৯৯৭ সালে এখানে আসেন নেদারল্যান্ড থেকে মিস মারিয়া গাসকার।

www.pathagar.com

১৯৯৯ সালে নার্সিং ইনস্টিটিউট ২৫ বছর পুর্তি উৎসব পালন করে। ২৫ বছরে এই প্রতিষ্ঠানের অর্জন বিশাল। এই সময়ে এখানে নার্সিং এ ভর্তি হয়েছে ৩৮৯ জন, নার্সিং পাশ করেছে ১৯৩ জন, ড্রপ আউট ৭৯ জন এবং বর্তমান (১৯৯৯) শিক্ষার্থী সংখ্যা ১১৭ জন। ১৯৯০ সাল থেকে ছাত্রদেরও নার্সিং শিক্ষায় ভর্তি ও প্রশিক্ষণ দান করা হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, নার্সিং ইনস্টিটিউটে খ্রিস্টান যুবক যুবতীদেরই ভর্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

মিশন উচচ বালিকা বিদ্যালয়

প্রেসবিটারিয়ান চার্চের শিক্ষা কার্যক্রমের একটি উজ্জ্বলতম উদাহরণ রাজশাহীর মিশন উচচ বালিকা বিদ্যালয়। বর্তমানে এটি রাজশাহী শহরের কোর্ট ভবনের সামনে চার্চ অব বাংলাদেশ এর ক্যাম্পাসে অবস্থিত। মিশন স্কুলের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। ১৮৮৮ সালে ইংলিস প্রেসবিটারিয়ান মিশন রাজশাহীতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে[৪০]। তখন স্কুল চলত নগরীর হেতেম খাঁ এলাকার একটি ভাড়া করা বাড়িতে। বিদ্যালয়টির নাম ছিল 'মিশনস স্কুল'। ১৯৬৮ সালে বর্তমান ভবনে স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৭ সালে মিশন স্কুল মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে উন্নীত হয় ১৯৭০ সালে এখানকার ছাত্রীরা প্রথম এস এস সি পরীক্ষা দেয়। ১৯৭১ সালে স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। রাজশাহী মিশন স্কুল মেয়েদের জন্য , তবে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পড়াশুনা করে। বর্তমানে রাজশাহী শহরে অবস্থানকারী সব ধর্মেরই প্রায় ১৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই স্কুলে অধ্যয়ন করছে। শিক্ষক সংখ্যা ২২, স্কুলটি সরকারী এমপিওভূক্ত।

স্কুলটিতে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের জন্য দুটি উপবৃত্তি চালু আছে। এর একটি হলো রাজশাহীর প্রখ্যাত ডাক্তার জোবেদা খাতুন তার মরহুম মায়ের নামে চালু করেছেন নূরজাহান স্মৃতি তহবিল। বৃত্তির অর্থ সমান ভাগে বিভক্ত করে একাংশ মুসলিম মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত। অন্য বৃত্তিটি হলো 'খ্রিস্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ' (C.C.D.B) এর সাবেক ডিরেক্টর শ্রীলংকান নাগরিক হ্যারি জয় সিং প্রদত্ত বৃত্তি[৪১]। এ সমস্ত উপবৃত্তির সহায়তা নিয়ে মেধাবী দরিদ্র অনেক ছাত্রী উপকৃত হয়েছে এবং হচ্ছে।

রাজশাহী মিশন স্কুল প্রেসবিটারিয়ান চার্চ অব বাংলাদেশ পরিচালিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর সভাপতি হন পদাধিকারবলে চার্চ অব বাংলাদেশ, কুষ্টিয়া ডায়োসিস প্রধান। ২২ জন শিক্ষক শিক্ষিকার মধ্যে প্রধান শিক্ষিকা, সহকারী প্রধান

www.pathagar.com

শিক্ষকসহ ৭ জন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের। স্কুলটি পরিচালনার জন্য ইতিপূর্বে সমস্ত ব্যয় বহন করত চার্চ কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে চার্চ খুব সামান্য অর্থই দিয়ে থাকে। তবে বড় বড় নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে চার্চ অর্থ যোগান দেয়[৪২]।

সাঁওতাল মিশন

খ্রিস্টান সম্প্রদায় এই মিশনকে বলেন 'সাঁওতাল মন্ডলী'। রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে রাজশাহী, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, দিনাজপুর, বগুড়া ও রংপুর জেলায় সাঁওতাল উপজাতির বাস। খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টার কারণে এ সমস্ত সাঁওতালদের একটি বড় অংশ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। ধর্মান্তরিত সাঁওতালরা ছিলেন রোমান ক্যাথলিক ও লুথারেন মন্ডলী সম্প্রদায়ের। রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ইত্যাদি জেলায় প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের খ্রিস্টান সাঁওতাল ছিল না। ১৯৪০ সালের দিকে রাজশাহী শহরের পশ্চিমে পাথরঘাটা গ্রামে কিছু সাঁওতাল ব্যাপ্টিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু নিয়মিত পরিচর্যার অভাবে তারা আদি ধর্মে ফিরে যায়। তাই সাঁওতালদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রেসবিটারিয়ান চার্চের প্রচারনা চালানো ও তাদের আলাদাভাবে খ্রিস্টান ধর্মের নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দেয়ার জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয় এই সাঁওতাল মিশন।

সাঁওতাল মিশন প্রতিষ্ঠায় গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ব্রিটিশ প্রেসবিটারিয়ান মিশনারী রেভারেন্ট এ জি ম্যাকলাউড ও রেভারেন্ট ব্রায়ান ডসন[৪৩]। তাদের সাথে ছিলেন একজন বাঙালী পাদ্রী, যিনি সাঁওতালদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে স্মরণীয় অবদান রেখেছেন, তিনি হলেন রেভারেন্ট প্রিয় কুমার বারুই। তাদের প্রচেষ্টায় রাজশাহীর বেলঘরিয়া গ্রামের ৫টি সাঁওতাল পরিবার প্রথম খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। ১৯৫১ সালের ৫ মার্চ তারিখে রেভারেন্ট প্রিয় কুমার বারূই এই ৫টি পরিবারকে ধর্মান্তরিত করেন। তারা হলেন, বেলঘরিয়া গ্রামের হাড়মা হেমব্রম ও তার স্ত্রী ধানী হেমব্রম এবং তাদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে, (২) ব্রজনাথ সরেন ও তার স্ত্রী রাণী সরেন এবং তাদের চার ছেলে ও এক মেয়ে, (৩) কুমার হেমবম ও তার স্ত্রী দুলান হেমব্রম এবং তাদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে, (৪) সুবোধ হেমব্রম ও তার স্ত্রী পানী হেমব্রম এবং তাদের পাঁচ ছেলে এবং (৫) তালা হাঁসদা ও তার স্ত্রী মায়নো হাঁসদা এবং তাদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে। এরাই হলেন রাজশাহী সাঁওতাল মিশনের প্রথম ব্যাপটিস্ট খ্রিস্টান।

রেভারেন্ড পি কে বারুই এর প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও উৎসাহে ধর্মান্তরিত সাঁওতালরাই পরবর্তীতে তাদের পুরোহিত হন। তাদের মধ্যে প্রথম ব্যাপ্টিস্ট

www.pathagar.com

খ্রিস্টান পুরোহিত হন চুনকা টুডু। চার্চ অব বাংলাদেশের দ্বিতীয় সাঁওতাল পুরোহিত হন রেভারেন্ট সালকু মুর্ম্মু। ১৯৫১ সালে বেলঘরিয়া গ্রামে সাঁওতাল মিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই গ্রামকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী আদিবাসী গ্রামগুলিতে সাঁওতালদের মাঝে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে। ১৯৫৭ সালে রাজশাহী শহরের মহিষবাথানে সাঁওতাল মিশন স্থাপিত হয়।

চার্চ অব বাংলাদেশের রাজশাহী ডিনারীর সাঁওতাল মিশনগুলি রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর ও গাইবান্দার পলাশবাড়িতে অবস্থিত। ১৯৯৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজশাহী ডিনারীতে ছোট বড় মোট ১৬টি মিশন আছে, তার মধ্যে ৪টি বাঙালী ও ১২টি সাঁওতাল মিশন। শিশু কিশোরসহ রাজশাহী ডিনারীর মধ্যে খ্রিস্টান সাঁওতাল সংখ্যা ১৬১৫ জন[৪৪]।

রাজশাহী ডিনারীর সাঁওতাল মিশন মহিলা কার্যক্রম, সান ডে স্কুল, যুব কার্যক্রম, সভা, সম্মেলন ও সেমিনারের মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। সাঁওতাল মিশনের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত সাঁওতালদের উপাসনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়ে থাকে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার কমলাপুকুর, বাবুল ডাং, নিমঘুটু, লালাদিঘি, আস্তাপুকুর, পাইতা পুকুর, বুলনপুর, রাজশাহীর বেলঘরিয়া, দুয়ারী প্রভৃতি গ্রামে সাঁওতালদের জন্য চার্চ, আবাসিক ব্যবস্থা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য কর্মসূচী সাঁওতাল মিশনের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে আসছে।

ছাত্র/ছাত্রী হোস্টেল

চার্চ অব বাংলাদেশের মর্ডারেটর ও ঢাকার বিপশ বি. ডি. মন্ডলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালে রাজশাহীতে জার্মানীর খ্রিস্টান দাতা সংস্থা 'এস.এম.এম' এর অর্থানুকুল্যে এ অঞ্চলের গরীব মেয়েদের জন্য একটি হোস্টেল স্থাপন করা হয়। রাজশাহী কোর্টের পশ্চিমে পদ্মা নদীর পাড়ে একটি ভাড়া বাড়িতে এই হোস্টেল ছিল। পরবর্তীতে এটিকে কোর্ট এলাকার মিশন ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত করা হয়। হোস্টেলের প্রথম ওয়ার্ডেন ছিলেন মি হাবিল কিস্কু। মিঃ কিস্কু বর্তমানে বাংলাদেশ লুথারেন চার্চে কর্মরত। পরবর্তীতে রাজশাহীর নিভৃত পল্লী পাইতাপুকুর, নওগাঁ, সৈয়দপুরে ছাত্রদের জন্য হোস্টেল স্থাপন করা হয়।

১৯৯০ সালে রাজশাহী মিশন ক্যাম্পাসে মহিলা কলেজ হোস্টেল নির্মাণ করা হয় মূলতঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, বি আই টি ও অন্যান্য কলেজগুলিতে অধ্যয়নরত খ্রিস্টান ছাত্রীদের থাকার জন্য। এ সমস্ত হোস্টেলে থেকে রাজশাহী

www.pathagar.com

অঞ্চলের অনেক ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে। চার্চ অব বাংলাদেশের অন্যান্য ডিনারীর ছেলে মেয়েরাও এসমস্ত হোস্টেলে থাকার সুবিধা পায়।

হোস্টেলে বসবাসরত মেয়েদের হাতে বিভিন্ন শিল্পকর্ম (কুটির শিল্প) তৈরী ও বাজারজাত করার জন্য রাজশাহী মিশন ক্যাম্পাসে ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ক্রাফট সেন্টার। এটি জার্মানী সি এম এস এবং কে এন এইচ এর অর্থানুকূলে চলে। বাংলাদেশ চার্চের মেয়েরা ছাড়াও অন্যান্য চার্চের মেয়েরাও এখানে হাতের কাজ শেখার সুযোগ পায়। উল্লেখ্য যে, নওগাঁর হোস্টেলে একটি ডে কেয়ার সেন্টারও রয়েছে[৪৫]।

রাজশাহী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (RRDP)

বাংলাদেশ চার্চের সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের (Church of Bangladesh Social Development Program) আওতায় বাংলাদেশের ৪টি প্রেসবিটারিয়ান ডিনারী (ধর্ম অঞ্চল)তেই সাধারণ মানুষের মাঝে কাজ করে যাচ্ছে। রাজশাহী জেলায় এই প্রজেক্টের নাম রাজশাহী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (Rajshahi Rural Development Project)। বর্তমানে কুষ্টিয়া ডায়োসিসের বিপশ 'রাইট রেভারেন্ট এম এস বাড়ৈ' রাজশাহী ডিনারীর ডীন থাকাকালীন ১৯৮৫ সালে RRDP প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এটির নাম ছিল সাঁওতাল সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (SSDP)। পরবর্তীতে কাজের পরিধি বেড়ে যায় এবং একটি এনজিও হিসেবে রাজশাহী জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং নতুনভাবে নামকরণ করা হয় 'রাজশাহী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প'। রাজশাহী মিশন ক্যাম্পাসেই এর প্রধান অফিস। সাব-অফিস দুটি; একটি পাইতাপুকুরে, দ্বিতীয়টি বেলঘরিয়ায়। বর্তমানে এই সংস্থার প্রধান প্রধান কর্মকান্ডগুলি হচেছঃ

ক) আর্থ- সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য সঞ্চয়ী দল গঠন

খ) মাইক্রো-ক্রেডিট প্রোগ্রাম (ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প)

গ) শিক্ষা কার্যক্রম

ঘ) কর্মীদের ও তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং

ঙ) পরিবেশ উন্নয়ন।

RRDP বিভিন্ন কর্মকান্ডে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, যাদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে তারা হলোঃ

www.pathagar.com

১. বিফর্ম চার্চেস ইন দ্য নেদারল্যান্ডস্ (Reformed Churches in the Netherlands)
২. খ্রিস্টিয়ান এইড ইউ. কে. (Christian Aid. U.K.)
৩. চার্চ অব বাংলাদেশ (Church of Bangladesh.)

অর্থাৎ রাজশাহী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে খ্রিস্টান চার্চ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও আর্থিক অনুদানপ্রাপ্ত একটি সংস্থা।

রাজশাহী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : আর আর ডি পি দরিদ্র জনগণকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে সদা বিরাজ করবে শান্তি, ন্যায় বিচার, সমতা, ভালবাসা আর সেবা। গ্রামের গরীব ও ভূমিহীন লোকদের বিশেষভাবে আদিবাসী সাঁওতালদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি বিধান করা। .

কর্ম এলাকা : আর আর ডি পি রাজশাহী, নাটোর নবাবগঞ্জ এই তিনটি জেলার ৬টি থানার ১১টি ইউনিয়নের ৫৫টি গ্রামের দরিদ্র আদিবাসী জনগণ, বিশেষ করে সাঁওতালদের মাঝে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে দেখা যায়, এ সমস্ত এলাকার ১৯৫০টি পরিবারে তারা সেবা দান করতে পেরেছেন।

কর্মসূচী সমূহ

আর আর ডি পি'র কর্মসূচীর প্রথম পদক্ষেপ দরিদ্র জনসাধারণকে সঞ্চয়ী করে তোলা। সঞ্চয় জমা করা ও তা মনিটরিং করার জন্য ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত করে দল গঠন করা হয়। প্রতি ৫ জনকে নিয়ে হয় একটি গ্রুপ। এরকম ৬টি গ্রুপকে নিয়ে ৩০ জন সদস্যের সঞ্চয়ে গঠিত হয় একটি প্রধান গ্রুপ। প্রতি ৩০ জন সদস্যের একটি প্রধান গ্রুপের মত মোট ১০টি গ্রুপ নিয়ে , যার সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় - ৩০ × ১০ - ৩০০ জন, গঠিত হয় গ্রাম ফোরাম এবং ৬-৭ টি গ্রাম ফোরাম নিয়ে, (১৮০০ - ২০০০ জন সদস্য সংখ্যা) গঠিত হয় আঞ্চলিক ফোরাম।

বেলঘরিয়া ও পাইতাপুর সাব সেন্টার দু'টিতে বিগত ৩১শে ডিসেম্বর ২০০০ পর্যন্ত ১৫১টি গ্রুপের অধীনে ১৯৫০ টি পরিবার আর আর ডি পি'র আওতায় এসেছে।

বাংলাদেশের দারিদ্র দারীকরণের জন্য বর্তমানে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হচেছ ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পকে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহও দারিদ্র দূরীকরণের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকেই উৎসাহিত করছেন।[৪৬] বাংলাদেশ সরকার, সরকারী

www.pathagar.com

সংস্থাসমূহ বিশেষ করে বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (BRDB) দারিদ্র দূরীকরণের জন্য যেমন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, তেমনি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণে এগিয়ে আসার জন্য অনুপ্রাণীত করছে ২০০০ সালের একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, RRDP তার সদস্যদের কাছ থেকে সঞ্চয় সংগ্রহ করেছে ১৫ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা আর সদস্যদের মাঝে বিনিয়োগ দিয়েছে ১৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা।

শিক্ষা কার্যক্রম : শিক্ষা রাজশাহী রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রগ্রাম (আর আর ডি বি)'র একটি অন্যতম প্রধান কার্যক্রম। সংস্থার পক্ষ হতে আদিবাসী শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষা দানের জন্য আলাদা আলাদা কর্মসূচী পালন করা হয়। এই সংস্থা শিশুদের জন্য ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে এবং এসমস্ত বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী (কিন্ডারগার্ডেন) থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৫০০ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে। সংস্থার শিক্ষাদান পদ্ধতি, স্কুল ভবন ও পরিবেশ বেশ আকর্ষণীয় হওয়ার কারণে শিশুরা ও তাদের পিতামাতারা স্কুলের ব্যাপারে বেশী আগ্রহী থাকে। শিশু শিক্ষার পাশাপাশি বয়স্কদের জন্যও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রতি ২০ জনকে নিয়ে একটা গ্রুপ তৈরী করে, তাদেরকে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়। ২০০০ সালে ২০০ বয়স্ক ব্যক্তিকে আর. আর. ডি. পি. শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এনেছে। এদের অনেকেই ছোট খাট বই পুস্তক পড়তে, তাদের নাম ও হিসাব পত্র লিখতে পারে। গত এক বছরে আর আর ডি পি'র শিক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেখানো হলো:

মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন বর্তমানকালে অতি প্রয়োজনীয় একটি দায়িত্ব। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে এটির প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। প্রায় প্রতিটি খ্রিস্টান সংস্থাই মানব সম্পদ উন্নয়নের কর্মসূচী পালন করে থাকে। বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এসব কর্মসূচী পালিত হয়। রাজশাহী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প আদিবাসী জনসাধারণ ও নিজস্ব কর্মীদের জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পালন করে থাকে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই সংস্থা তার সদস্যদের মধ্যে ৪৬৯ জনকে নার্সারী, পশুপালন, নার্সিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

অন্যদিকে, সংস্থার নিজস্ব কর্মীদের জন্য এ পর্যন্ত (ডিসেম্বর ২০০০) বৃত্তিমূলক ও অন্যান্য লীডারশীপ ট্রেনিং এর আয়োজন করেছে। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহের মধ্যে ছিল সাবান, চক. মোমবাতি ইত্যাদি তৈরী, সংস্থা পরিচালনা, পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন এবং শান্তি ও ন্যায় বিচার ইত্যাদি। ক্রিস্টিয়ান

www.pathagar.com

কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (C.C.D.B.), কারিতাস প্রভৃতি দেশীয় এবং ভারতের একটি সংস্থার সাথে যৌথভাবে এসমস্ত প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছে। কর্মী ও তৃনমূল পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর জন্য এ সমস্ত প্রশিক্ষণ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল[৪৭]।

চার্চ অব বাংলাদেশের স্যোসাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্যই মূলত রাজশাহী রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (R.R.D.B.) প্রতিষ্ঠিত। বেসরকারী এনজিও হলেও এটি চার্চ পরিচালিত ও আন্তর্জাতিক খ্রিস্টান সংস্থার অর্থ সাহায্য-নির্ভর একটি সংস্থা। কিন্তু এর উপরোক্ত কার্যক্রম বিশ্লেষণ ও মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে দেখা গেছে, খুব সীমিত পর্যায়ে সংস্থাটি কাজ করছে। 'সাঁওতাল সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প' নামে সংস্থাটি প্রথমে কাজ শুরু করেছিল। সুতরাং সাঁওতালদের মাঝেই এর কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। তবে বর্তমানে গ্রামের গরীব মুসলমানসহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও এর আওতায় এসেছে। সংস্থার কর্মসূচী ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তৎপরতা খুবই সামান্য। যে দুটি সাব সেন্টারে আর আর ডি পি বিভক্ত, বেলঘরিয়া ও পাইতাপুকুর এ দুটি গ্রামে প্রেসবিটারিয়ান চার্চের মিশনারীরা অর্ধ শতাব্দী আগে (১৯৪৯ সালে) সাঁওতালদের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার শুরু করেছিল। খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত ও ধর্মান্তরের জন্য সম্ভাবনাময় সাঁওতালদের মাঝেই এখন পর্যন্ত আর আর ডি পি তার কর্মসূচীকে সীমিত রেখেছে। রাজশাহীর বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য রাজশাহী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এর কোন কর্মসূচী নেই। আর উপজাতি সাঁওতালদের মাঝে বিগত পঞ্চাশ বছরে চার্চের সোস্যাল ডেভেলপমেন্টের কর্মসূচীর প্রভাব খুব সামান্যই চোখে পড়ে।

সাঁওতালরা দারিদ্রের তিমিরেই রয়ে গেছে। সাঁওতাল সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প কিংবা রাজশাহী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প সার্বিক দারিদ্র দূরীকরণে প্রসংশনীয় সফলতা অর্জন করতে পেরেছে বলে সংস্থার কর্ম এলাকা পাইতাপুকুর ও বেলঘরিয়া গ্রামের অধিবাসীদের জীবন যাত্রা দেখে মনে হয় না।

রাজশাহী সিটি চার্চ ঃ রাজশাহী সিটি চার্চ রাজশাহীতে প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি রাজশাহী শহরে খ্রিস্টান মিশন হাসপাতালের পশ্চিম পাশে অবস্থিত। প্রতি রবিবারে প্রার্থণা অনুষ্ঠান ছাড়াও চার্চ রাজশাহী শহরের প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়াদি পরিচালনা করে। চার্চের কার্যক্রম খুবই গোপনীয়তা রক্ষা করে পরিচালিত হয়।

www.pathagar.com

সেভেনথ্ ডে এ্যাডভেনটিস্ট চার্চের প্রতিষ্ঠানসমূহ

বাংলাদেশে সেভেনথ্ ডে এ্যাডভেনটিস্ট চার্চ ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্ম তৎপর। ১৯০৬ সাল থেকেই এদেশে এ্যাডভেনটিস্টগণ সক্রীয় আছেন। তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, যেমন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, কোরিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে দু' শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে মানুষের উন্নয়নের জন্য কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচেছ। প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান ধর্মীয় এই সম্প্রদায়টির অফিশিয়াল নাম বাংলাদেশ ইউনিয়ন মিশন অব সেভেনথ্ ডে এ্যাডভেনটিস্ট। মিশনের প্রধান কাজ হচেছ খ্রীস্টের বাণীর প্রসার ও প্রচার। তারা বাংলাদেশে যে সমস্ত কর্মসূচী পালন করছে তা হলোঃ

১. শিক্ষার প্রসার,
২. স্বাস্থ্য সেবা,
৩. এতিমদের লালন পালন,
৪. বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ,
৫. দরিদ্র লোকদের আর্থিক সহায়তা,
৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ তৎপরতা,
৭. বনায়ন কর্মসূচী,
৮. খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও ধর্মান্তরকরণ।

রাজশাহীতে এ্যাডভেনটিস্ট চার্চ এর সরাসরি কিছু কার্যক্রমও রয়েছে। বাংলাদেশে এ্যাডভেনটিস্ট চার্চের ৪টি সেকশনের মধ্যে রাজশাহী জেলা পশ্চিম সেকশনের অধীনে পড়ে। সেকশন কার্যালয় জয়পুরহাট-এ অবস্থিত। জয়পুরহাটে এ্যাডনেটিস্ট চার্চ এর অফিসটিসহ এ্যাডভেনটিস্টদের মিশনগুলি বিশাল এলাকা নিয়ে এবং জাঁকজমকপূর্ণ শৈল্পিক প্রাসাদ সমন্বয়ে গঠিত এবং নিজস্ব সম্পত্তিতে ভবন নির্মিত। দূর্ভেদ্য অভ্যন্তরীণ গঠন সমৃদ্ধ প্রাসাদগুলি শাক সবজির বাগান, হরেক রকম ফুল ও ফলের গাছ দ্বারা বেশ সুসজ্জিত।

রাজশাহী জেলায় এ্যাডভেনটিস্ট চার্চ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে শহরের ক্যান্টনমেন্ট সড়ক, উপশহরে অবস্থিত এ্যাডভেনটিস্ট ইন্টারন্যাশনাল মিশন স্কুল, তানোর, গোদাগাড়ী প্রভৃতি থানায় ২৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২৩ টি গীর্জা উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

তিনি জানান, স্কুলে বিশেষ কোন ধর্ম পড়ানো হয় না। তবে সকল ধর্মের মূল কথা - নৈতিকতা, তাই শিক্ষাদান করা হয়। বাংলাদেশের তথা বিশ্বের জন্য উন্নত মানসিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক উপহার দেওয়াই স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

এ্যাডভেনটিস্ট চার্চের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম ঃ সেভেনথ ডে এ্যাডভেনটিস্ট চার্চ পরিচালিত বিভিন্ন মানব উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মসূচী, স্বাস্থ্য সেবা, হস্তশিল্প ইত্যাদি। তন্মধ্যে একটি হলো গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী। এই বিভাগটির নাম Adventist Development for Rural Area (ADRA). এটি একটি এনজিও। তবে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় এ্যাডভেনটিস্টদের বিভিন্ন ইউনিটের মাধ্যমে। রাজশাহীতে তানোর থানার মোহর, কচুয়া, গোদাগাড়ী থানার দিকগ্রাম, ফাদিলপুর, কাকনহাটসহ ২৩ টি গ্রামে এড্রা'র (ADRA) কাজ আছে।

স্বাস্থ্য সেবা ঃ স্বাস্থ্য সেবার একটি বিশেষ ক্ষেত্র হলো দন্ত বিভাগ। এ্যাডভেনটিস্টগণ বাংলাদেশে ডেন্টাল মেডিক্যাল সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র নেটওয়ার্ক তৈরী করেছে। তাদের ডেন্টাল ক্লিনিকের নাম Adventist Dental Clinic (A.D.C). এটির প্রধান কার্যালয় বা ক্যাম্পাস ঢাকার গুলশানে; তবে সিলেট, চট্টগ্রাম, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর প্রভৃতি স্থানে ডেন্টাল ক্লিনিকের স্যাটেলাইট কেন্দ্র আছে। তাছাড়াও A.D.C'র রয়েছে ডেন্টাল মেডিকেল টিম ওয়ার্ক। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এ্যাডভেনটিস্ট ডেন্টাল ক্লিনিকের ডাক্তারদের টিম দেশের বিভিন্ন স্থানে ডেন্টাল মেডিকেল ক্যাম্প করে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা সেবা প্রদান করে। কোন প্রতিষ্ঠান, এনজিও কিংবা কম্যুনিটি দরিদ্র মানুষের জন্য ডেন্টাল মেডিকেল সেবার আয়োজন করলে A.D.C সেই স্থানে টিম পাঠায়।

হস্তশিল্প ঃ এ্যাডভেনটিস্ট চার্চের আরেকটি প্রকল্প হলো হস্তশিল্প। 'Polyog' নামে তারা প্রকল্পটি চালায়। দুস্থ মহিলাদের হাতে তৈরী বিভিন্ন শিল্প দ্রব্য তৈরী করে তা বাজারজাত করার ব্যবস্থা করা হয়। এসব পণ্য বিদেশেও রপ্তানী করা হয়। ঢাকার মিরপুর 'Polyog' এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং গুলশানে রয়েছে বিক্রয় কেন্দ্র।

ডোমিয়েন ফাউন্ডেশনের যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ নিরাময় কার্যক্রম ঃ ডোমিয়েন ফাউন্ডেশন সম্পূর্ণভাবে যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ নিরাময় ও প্রতিকারের জন্য নিয়োজিত একটি বেসরকারী সংস্থা। এটি কোন খ্রিস্টান সংস্থা নয় বলে এর কর্তারা দাবী করেন। কিন্তু এর প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম সবই খ্রিস্টান

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত। তাই ডোমিয়েন ফাইন্ডেশনের কার্যক্রম এই একই ধারার বলে মনে করা হয়।

মি. ডোমিয়েন ছিলেন বেলজিয়ামের একজন ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী পুরোহিত। তারই আর্থিক সাহায্যে এবং নামানুসারে গড়ে ওঠে 'ডোমিয়েন ফাউন্ডেশন'। যক্ষা ও কুষ্ঠ (TB & Leprosy) রোগের চিকিৎসা এর প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য। বর্তমানে বিশ্বের ২৭টি দেশে ডোমিয়েন ফাউন্ডেশনের কাজ চলছে। পাকিস্তানসহ অনেক দেশেই ডোমিয়েন তার কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কারণ হিসেবে সংস্থা বলেছে, ঐ সকল দেশের সরকার তাদের সহায়তা করেনি।

বাংলাদেশে ডোমিয়েন ফাউন্ডেশন যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ থেকে মানুষকে সুস্থ করার জন্য কাজ করে যাচেছ। বাংলাদেশের ৪টি অঞ্চলে তারা কাজ করছে। অঞ্চল ও আঞ্চলিক কার্যালয়গুলি হলো নিম্নরূপঃ

১. নেত্রকোনা
২. ময়মনসিংহ
৩. টাঙ্গাইল
৪. রাজশাহী

সম্প্রতি সরকার ফরিদপুর অঞ্চলে ডোমিয়েনকে কাজ করার জন্য অনুমতি প্রদান করেছে এবং ফরিদপুরকে কেন্দ্র করে ঐ এলাকায় ডোমিয়েন কাজ করার জন্য প্রস্তুতি নিচেছ।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল দেশেই সরকারী হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকের সাথে ডোমিয়েন যৌথভাবে কাজ করছে। এর ব্যয়ের ৭৫% বেলজিয়াম সরকার দেয়। বাঁকীটা দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বাংলাদেশ সরকার ডোমিয়েন ফাউন্ডেশনকে অবকাঠামোগত সাহায্য ও আসবাবপত্র সরবরাহ করে থাকে। ঢাকাস্থ বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদুত ডোমিয়েন ফাউন্ডেশনকে দেখাশোনা করেন[৫২]। তা ছাড়াও বাংলাদেশে ডোমিয়েন এর কানট্রি ডিরেক্টর হলেন মি. উইলিয়াম গীজ।

রাজশাহীতে ডোমিয়েন ফাউন্ডেশনের অনেকগুলি সেবা কেন্দ্র আছে। রাজশাহী শহরে ডোমিয়েন কাজ করে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সাথে। ডোমিয়েনের সেবা কেন্দ্রগুলি থেকে যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশকে কুষ্ঠ ও যক্ষামুক্ত করার জন্য ডোমিয়েন ময়মনসিংহে স্থাপন করেছে কুষ্ঠ ও যক্ষা নিরাময় হাসপাতাল এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ডোমিয়েনের হাসপাতাল ও সেবা কেন্দ্রে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

তথ্যসূত্র

১. তানভির আহমেদ, গ্রামীন অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ ও লগ্নী পুঁজি জোরদার বিদেশী তৎপরতার লক্ষ্য, *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।

২. মুহাম্মদ এনামুল হক জাল্লাবাদী, *এনজিও ষড়যন্ত্রের কবলে বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৪৬।

৩. ফাদার লুইজি পিনোস পিমে, *উত্তরবঙ্গে ক্যাথলিক মন্ডলীর শুভ সূচনা ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ*, আসাদ এভিনিউ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৪ ।*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

৪. খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য সুদুর ইতালী থেকে আগত ত্যাগী ক্যাথলিক ধর্ম যাজকদের বলা হয় 'পিমে'।

৫. ফাদার লুইজি পিনোস পিমে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫ ।

৬. কাজী মোঃ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস*(১ম খন্ড), বগুড়া, ১৯৬৫, পৃ.২১।

৭. দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৯ জুলাই, ১৯৯২।

৮. আসগার হোসেন ,অভিশপ্ত *এনজিও এবং আমাদের ধর্ম স্বাধীনতা ও নারী*, প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭ পৃ. ৩২-৩৪।

৯. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬।

১০. আসগার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।

১১. এডাব ডাইরেক্টরী, ২০০০।

১২. আসগার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২।

১৩. সেভেনথ্ ডে এ্যাডভেনটিস্ট চার্চ এর পরিচিতি সম্পর্কে মৌখিক তথ্য প্রদান করেছেন এ্যাডভেনটিস্ট ইন্টারন্যাশনাল মিশন স্কুল, রাজশাহী'র জনৈক শিক্ষক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এ্যাডভেনটিস্ট চার্চের অনুসারী।

১৪. এনামুল হক জাল্লাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬।

১৫. এডাব ডাইরেক্টরী, ১৯৯৬-১৯৯৭।

১৬. এনামুল হক জাল্লাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।

১৭. দৈনিক বাংলা, ২৫ জুন, ১৯৯৪।

১৮. এনামুল হক জাল্লাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।

১৯. *তদেব*, পৃ. ১২৪।

www.pathagar.com

২০. এডাব ডাইরেক্টরী, ১৯৯৬-১৯৯৭।

২১. এডাব, রাজশাহীর বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৮।

২২. *তদেব*।

২৩. এনামুল হক জাল্লাবাদী, *প্রাগুক্ত* পৃ. ১৩৫।

২৪. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬।

২৫. এডাব ডাইরেক্টরী ১৯৯৬-১৯৯৭।

২৬. এডাব ডাইরেক্টরী ১৯৯৬-১৯৯৭।

২৭. এই সংস্থার মতবাদে বিশ্বাসীরা ঈসা (আঃ) কে 'যীহোবা ঈশ্বর' বলে ডাকেন।

২৮. পাক্ষিক প্রহরী দূর্গ (ওয়াচ টাওয়ারের একটি প্রকাশনা), ১৫ জুলাই, ১৯৯৯।

২৯. 'ওয়াচ টাওয়ার' সম্পর্কে মৌখিক তথ্য প্রদান করেছেন ওয়াচ টাওয়ার অফিস, ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও, ঢাকায় কর্মরত জনৈক কর্মকর্তা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এই মিশনের অনুসারী।

৩০. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬।

৩১. এডাব ডাইরেক্টরী, ১৯৯৬-১৯৯৭।

৩২. করিতাসের পরিচিতি পত্র, তারিখ বিহীন।

৩৩. এডাব ডাইরেক্টরী, ১৯৯৬-১৯৯৭।

৩৪. আব্দুল মান্নান, *প্রাগুক্ত*।

৩৫. এডাব রাজশাহীর বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৬-১৯৯৭।

৩৬. আব্দুল মান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

৩৭. যেমন খ্রিস্টিয়ান হাসপাতাল ও কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা; ল্যাম্ব হাসপাতাল, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ইত্যাদি।

৩৮. ইনসাইড আউট (প্রেসবিটারিয়ান সংবাদ সাময়িকী), ইস্যু নম্বর- ২০

৩৯. রজত জয়ন্তী স্মরণীকা, ডাঃ এলিজাবেথ কনান মেমোরিয়ার নার্সিং ইনস্টিটিউট, খ্রিস্টিয়ান মিশন হাসপাতাল, রাজশাহী, ১৬ এপ্রিল ১৯৯৯।

৪০. স্যামুয়েল প্রনয় সরকার, রাজশাহী ডিনারীর কার্যক্রম, সাঁওতাল মন্ডলীর সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ২০০০ খ্রিস্টাব্দ জুবিলী বছরের স্মরণিকা, ২৩-২৬ মার্চ, বেলঘরিয়া- পাইতাপুকুর, রাজশাহী, পৃ. নম্বরবিহীন।

৪১. দৈনিক প্রথম প্রভাত, রাজশাহী, ৯ই অক্টোবর ২০০০।

৪২. রাজশাহী মিশন গার্লস হাইস্কুলের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেছেন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মি. ডেরিক হর্ষ বিশ্বাস।

৪৩. রেভারেন্ড সালকু মর্মু, সাঁওতাল মন্ডলীর সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ২০০০ খ্রিস্টাব্দ জুবিলী বছরের স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. নম্বরবিহীন।

www.pathagar.com

৪৪. স্যামুয়েল প্রণয় সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. নম্বরবিহীন।

৪৫. স্যামুয়েল প্রণয় সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. নম্বরবিহীন।

৪৬. এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘ ঘোষিত ১৯৯৭-২০০৬ সালকে দারিদ্র দূরীকরন দশক, সার্কের (SAARC) ঢাকা ঘোষণায় ২০০২ সালের মধ্যে দারিদ্র দূরীকরনে সিদ্ধান্ত, ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত কোপেন হেগেনের সোস্যাল সামিট, ১৯৯৭ সালে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত মাইক্রো ক্রেডিট সামিট, বিশ্ব খাদ্য সংস্থার রোম ঘোষণা ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়।

৪৭. বার্ষিক প্রতিবেদন, রাজশাহী রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ২০০০।

৪৮. প্রসপেক্টাস, এ্যাডভেন্টিস্ট ইন্টারন্যাশনাল মিশন স্কুল (ইংলিশ মিডিয়াম), রাজশাহী, শিক্ষাবর্ষ- ২০০০ ।

৪৯. প্রসপেক্টাস, এ্যাডভেন্টিস্ট ইন্টারন্যাশনাল মিশন স্কুল, প্রাগুক্ত।

৫০. দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ এপ্রিল, ১৯৯৯।

৫১. এ্যাডভেন্টিস্ট ইউনিভার্সির এসবল তথ্য ১৯৯৮ সালে সংগৃহীত।

৫২. ডেমিয়েন ফাউন্ডেশন সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রদান করেছেন নাম প্রকাশ না করার শর্তে ফাউন্ডেশনের জনৈক কর্মকর্তা, যিনি টিবি ও লিপ্রোসি নিয়ন্ত্রণ অফিসার হিসেবে কর্মরত।

www.pathagar.com

অধ্যায় তিন

আদিবাসীদের ধর্মান্তর

বিশ্বের সবচেয়ে প্রচারমুখী ধর্ম সম্ভবত খ্রিস্ট ধর্ম। উন্নত রাষ্ট্রগুলি এই ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে সেসব রাষ্ট্র থেকে সরকারি ও বেসরকারী উদ্যোগে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে, বিশেষ করে অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশ সমূহে নিরন্তরভাবে ধর্ম প্রচারের কাজ চলছে। তাদের প্রচেষ্টার ফলে মানুষ তাদের পূর্বতন ধর্ম-বিশ্বাস ও আবহমান কালের সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিতও হচ্ছে। আমাদের দেশের আদিবাসীরা এই পরিস্থিতিতে পড়ে নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছেন। এই প্রবণতার পেছনে খ্রিস্টান সংস্থাগুলির প্রচারণার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাও বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে বলে আমাদের মনে হয়েছে।

ধর্মান্তর প্রক্রিয়া

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যেখানে অত্যন্ত জোরালোভাবে খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এদেশে প্রায় ৫২ টিরও বেশী সংস্থা খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত আছে। তারা এদেশের আদিবাসীদের মাঝে কাজ করছে। তবে তারা জোর করে কাউকে খ্রিস্টান বানাচ্ছে বললে ভুল হবে। বরং আদিবাসীদের মধ্যে যারা খ্রিস্টান হচ্ছে, তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে মিশনারীদের কার্যক্রম তাদেরকে খ্রিস্ট ধর্মের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এক পর্যায়ে তারা নিজ ধর্ম বিষর্জন দিয়ে খ্রিস্টান হতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায়, যারা বিভিন্ন সমস্যায় কিংবা অভাবে পড়ে মিশনারীদের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন সেবা গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে এবং মিশনারীদের সেবা, ব্যবহার, চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছে তাদেরই কেউ কেউ খ্রিস্টান হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করলে তাকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে। শেষোক্ত মন্তব্যটি মিশনারীদের নিজস্ব [১]।

খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয় অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে, সাধারণ লোক-চক্ষুর অন্তরালে। তাদের চার্চ ও আবাসিক এলাকা সবই উঁচু প্রাচীর ঘেরা এবং যাতায়াত ও যোগাযোগ সীমিত পরিসরের মধ্যে। হয়ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দূরে থাকার জন্যই এই নিচ্ছিদ্র ব্যবস্থা। এমনি পরিবেশে ধর্মান্তরের কাজটি তারা করে থাকেন অতি সংগোপনে। কোন চার্চ কিংবা খ্রিস্টান চ্যারিটি সংগঠন অথবা খ্রিস্টান ধর্মের দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তি ধর্মান্তর কার্যক্রম সম্পর্কে যথাসম্ভব সতর্ক মন্তব্য করে থাকেন। ফলে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য

www.pathagar.com

তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়না। সম্ভবত এই কারণেই বাংলাদেশ সরকারের নিকটও খ্রিস্টান মিশনারীদের তৎপরতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই। তবে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত জনসংখ্যা রিপোর্টের ধর্মভিত্তিক সংখ্যা ও তার বৃদ্ধির হার থেকে খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা ধারণা পাওয়া যায়। কারণ, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার, তা স্বাভাবিক জন্ম হার নয়, জন্ম হারের চেয়েও অনেক বেশী। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশে খ্রিষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তর কার্যক্রম চলছে জোরালোভাবে এবং তা অবশ্যই অদৃশ্যভাবে, লোকচক্ষুর অন্তরালে।

এ দেশে প্রধানতঃ উপজাতীয়রাই খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হচেছ সবচেয়ে বেশী। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নীতিও ঠিক এ রকমই। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে মুসলিমপ্রধান এ দেশে একটি ভারসাম্যপূর্ণ খ্রিস্টান জনসংখ্যা তৈরী করা তাদের উদ্দেশ্য। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, পোপ জন পলের একটি মন্তব্য থেকে। ১৯৯৯ সালে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান দ্বিতীয় পোপ জন পল দক্ষিণ এশিয়া সফরে এসে ভারতে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, এশিয়ায় খ্রিস্ট ধর্ম টিকে থাকবে ধর্মান্তরের মাধ্যমে[২]।

বাংলাদেশ দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত একটি অনুন্নত দেশ। এখানে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মান খুবই করুণ। আর উপজাতীয় লোকদের জীবন যাপন আরও মানবেতর এবং কষ্টকর। আদিবাসী পল্লীগুলিতে মাটির কুঁড়ে ঘরে অত্যন্ত করুণভাবে তারা বেঁচে আছে। জীবিকার জন্য তারা বন জঙ্গল এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এ সকল উপজাতীয় লোকদের অনেকেই পেট পুরে খাবার, নিরাপদ আশ্রয়, এমন কি জীবনের নিরাপত্তাও অনেক সময় পায়না। খ্রিস্টান মিশনারীরা এদেশের এই অসহায় ও বঞ্চিত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, মগ, মুরংসহ অন্যান্য জাতির, সিলেটের খাসিয়া, ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারো জাতির, হবিগঞ্জ জেলার খাসিয়া জাতি, বরেন্দ্র অঞ্চলের সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুন্ডা, মাহালী, রবিদাস, রাজবংশী, কোচ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মাঝে বিশেষভাবে খ্রিস্টান মিশনারী ও স্বেচছাসেবী সংস্থাসমূহ নিরবচিছন্নভাবে কাজ করে চলেছে। এ সমস্ত জাতির একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা ইতিমধ্যে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। রাজশাহী জেলার সাঁওতালসহ অন্যান্য উপজাতীয়দের ধর্মান্তরের পেছনে কারণ মূলত দুটি; যথা -

এক. দারিদ্রতার সুযোগে মিশনারীদের সুকৌশল নিরন্তর প্রচেষ্টা : এদেশের কর্মরত খ্রিস্টান মিশনারী ও স্বেচছাসেবী সংস্থাগুলি একে অন্যের পরিপূরক হয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আদিবাসীদের মাঝে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করছে।

www.pathagar.com

এ ক্ষেত্রে মিশনারী ফাদারদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও ত্যাগের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা যে আন্তরিকতা ও নিরবচ্ছিন্ন মনোভাব নিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন, তার ফলাফল অনুকূলে আসতে বাধ্য। ফাদারদের 'মিশনারী' জীবন ধর্ম প্রচারে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছিলাম উইলিয়াম কেরীর কথা, যিনি সুদূর লন্ডন থেকে ধর্ম প্রচারের জন্য এদেশে এসেছিলেন এবং সুন্দরবন এলাকায় জমি তৈয়ার করে চাষাবাদের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেছেন, তার এই আত্মত্যাগ বিফলে যায়নি। এ দেশে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা ছাড়াও এই উপমহাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে একটি 'খ্রিস্টীয় প্রভাব' সৃষ্টি করতে তিনি সফল হয়েছিলেন। বর্তমান কালেও খ্রিস্টান মিশনারীদের অবদান ও মনোভাব ঠিক একই প্রকৃতির। গবেষণাধীন এলাকা- রাজশাহী জেলায়ও এরকম বেশ কয়েকজন ত্যাগী ধর্মপ্রাণ ফাদার তাদের কর্ম-নিষ্ঠার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ অঞ্চলে যে খ্রিস্টান সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তার পশ্চাতেও রয়েছে খ্রিস্টান পালক-পুরোহিতগণের নিরন্তর প্রচারনা ও অক্লান্ত প্রয়াশ[৩]।

স্বেচছাসেবী সংস্থাগুলির আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডগুলি আদিবাসী জনসাধারণের ভাগ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছে। যে সাঁওতাল পরিবারটি আগে খাদ্যের জন্য বনে বনে ঘুরত শিকারের খোঁজে; শিকার না পেলে অর্ধাহারে-অনাহারে তাদের দিন কাটতো। খ্রিস্টান হবার পর সেই সাঁওতাল পরিবারটির আজ সে দূর্দিন নেই। স্বেচছাসেবী সংস্থার কল্যাণে পরিবারের কর্তা ব্যক্তিটি কাজ পেয়েছে, মহিলারা কুটির শিল্পে কাজ করছে, ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাচেছ। এমনি আর্থিক স্বচছলতা ও সামাজিক উন্নয়নের প্রত্যাশাই তাদেরকে মিশনারী ফাদারদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

সাঁওতালসহ আদিবাসীদের অনেকেই অসুখে ভাল চিকিৎসা পায় না। ফলে তারা বিভিন্ন রোগে দীর্ঘদিন ধরে ভুগে থাকেন। মিশনারীদের নজরে আসার কারণে কিংবা খ্রিস্টান এনজিও'র স্বাস্থ্য সেবার আওতায় ঐ গরীব সাঁওতাল বিনামূল্যে চিকিৎসা পায়। তাকে কখনও খ্রিস্টান মিশন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুকে ক্রস (–) ঝুলিয়ে হাসপাতালের খ্রিস্টান নার্স পরম যত্নে ঐ রোগীকে ঔষধ খাওয়ায়, তার সুস্থতা কামনা করে বলে - "যীশু আপনাকে সুস্থ্য করুন", "প্রভূ যীশু আপনাকে নিশ্চয়ই সুস্থ্য করবেন"। আন্তরিক সেবা আর উন্নত চিকিৎসা পেয়ে রোগী সুস্থ্য হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেন, কিন্তু তিনি যে সেবাটি পেলেন সারা জীবন তা ভুলতে পারেন না, অবশেষে একসময় তিনিও ফাদারদের সংস্পর্শে আসেন। শুরু হয় তার নতুন এক ধর্মীয় উত্তরণের পথ।

www.pathagar.com

খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থাগুলি আদিবাসী বেকার যুবকদের বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ট্রেনিং দিয়ে থাকে। ট্রেনিং শেষে তাদের ছোট খাট কাজও দেয়া হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, স্কুলের শিক্ষকতা, অফিসের কাজ, নার্সিং প্রভৃতি কাজে মিশন বেকারদের কর্ম সংস্থান করে দিচ্ছে। খ্রিস্টান সংস্থার কল্যাণে কাজ পাওয়া এ সকল যুবক স্বভাবতই খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি ঝুকে পড়ছে। অনেকেই আবার একটা কাজ পাওয়া যাবে- এমন আশায় ফাদারদের সাহচর্য্যে আসছে, এক সময় তারা কাজ পাচ্ছেও। এ সকল সুবিধাভোগী ও ধর্মান্তরিতরা আবার প্রতিবেশী অখ্রিস্টান উপজাতীয় লোকদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ফলে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি তুলে ধরে সুক্ষ্মভাবে তাদের আত্মীয় স্বজনদের প্রভাবিত করছে।

রাজশাহীর রাজপাড়া থানার কোর্ট এলাকায় চার্চ অব বাংলাদেশ, মহিষবাথানে কারিতাস, ডিঙ্গাডোবায় ক্যাথলিক মিশনের খ্রিস্টান পল্লীগুলিতে সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে যে, ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে সাঁওতালরা নিরাপদ বাসস্থানের নিশ্চয়তা পেয়েছে। অবশ্য ফাদারদের কথা না শুনলে কিংবা অসামাজিক কোন কাজ করলে তাদেরকে বাড়ী ছাড়া করে দেয়ার হুমকি রয়েছে। কিন্তু আপাতত তো ঘর মিলেছে! এটাই তাদের বড় পাওয়া। রাজশাহী, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর প্রভৃতি জেলা থেকে দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্থ সাঁওতালরা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে রাজশাহীতে এসেছে। মিশন তাদেরকে দু' কামরার পাকা ঘর দিয়েছে। এ সমস্ত পল্লী উচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। চোর-ডাকাত, সন্ত্রাস থেকে তারা অনেকটা নিরাপদ। তাদের সন্তানরা মিশন স্কুলে পড়ছে বিনামূল্যে। বিনা খরচে স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে। খ্রিস্টান হওয়ার পর এই যে জীবন যাত্রার একটা পরিবর্তন, ধর্মান্তরিত হওয়ার পর এত সব পাওয়ার সাক্ষাত সম্ভাবনা অন্যান্য অখ্রিস্টানদের আকৃষ্ট করছে।

রাজশাহীর খ্রিস্টান পল্লীগুলিতে ঘুরে এবং তাদের সাথে কথা বলে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, সাঁওতাল কিংবা উপজাতীয়রা মিশনারীদের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিয়ে উন্নত জীবন যাপনের অভিপ্রায়ে ফাদারদের সংস্পর্শে এসেছে এবং খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে।

দুই. শিক্ষার প্রসার ও মন মানষিকতার উন্নতি : রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার দেওপাড়া ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কয়েকটি সাঁওতাল পল্লীতে দেখা গেছে, ঐ পল্লীর অধিকাংশ সাঁওতালই খ্রিষ্টান হয়েছে। দেখা গেছে, পল্লীর শিক্ষিত ও যুবক শ্রেণীর সাঁওতালদের মধ্যে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা অত্যন্ত বেশী। রাজশাহী সদর থানার হড়গ্রাম ইউনিয়নের পূর্ব মোল্লাপাড়ায় খ্রিষ্টান সাঁওতাল পল্লীর অবস্থাও একই রকম। অপেক্ষাকৃত শিক্ষার আলো পেয়েছে এমন ব্যক্তিদের ধর্মান্তরিত হওয়ার আগ্রহ বেশী।

www.pathagar.com

অর্থাৎ যারা শিক্ষালাভ করার সুযোগ পেয়েছে, তারা সনাতন সাঁওতাল ধর্মে নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। (অবশ্য সকল শিক্ষিত সাঁওতালই যে এমন ধারণা পোষণ করেন এমন নয়) মিশনারীদের সংস্পর্শে আসার কারণে একদিকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার আশ্বাস, অন্য দিকে সাঁওতাল ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা সৃষ্টি তাদেরকে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

আদিবাসীরা আর নিজেদের অশিক্ষিত রাখতে চায় না। তারা এখন নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশ সচেতন। তারা মনে করে, পড়াশুনা করে শিক্ষিত না হলে উন্নতি করা সম্ভব নয়। তারা এটাও জানে, গরীব আদিবাসীদের পক্ষে বেশী দূর পড়াশুনা (উচচ শিক্ষা) করা সম্ভব নয়। তাই তারা অনেকেই তাদের সন্তানদের জন্য, আবার কেউ নিজে উচচ শিক্ষিত হবার জন্য খ্রিস্টান হচ্ছে।

সাঁওতালদের মধ্যে যারা খ্রিস্টান হয়েছেন, তাদের অনেকেই বলেছেন সাঁওতাল ধর্মের অসারতা সম্পর্কে। তাদের মতামত হলো, "*আমাদের ধর্ম (সাঁওতাল) সম্পর্কে আমরা তেমন কিছুই জানি না। আমাদের ধর্মের এমন কোন লোক (পুরোহিত) নেই যারা আমাদের এ ব্যাপারে জ্ঞান দান করতে পারে। এই কারণে আমরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঠিকমত পালন করতে পারি না। ফলে আমরা খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি*"। অর্থাৎ সুন্দর একটি ধর্মীয় পরিচয়ের আকাংখায় কেউ কেউ খ্রিস্টান হয়েছেন।

এভাবে শিক্ষার বিস্তার ঘটার পাশাপাশি তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং তার প্রভাব পড়তে থাকে তাদের ধর্মীয় জীবনে। আর মিশনারী ফাদাররা তো পাশেই আছে, তারা সার্বক্ষণিকভাবে তাদের প্রভাবিত করার চেষ্ঠা করছে। শিক্ষিত সাঁওতাল যারা খ্রিস্টান হয়েছেন, তাদের মনোভাব হল, *'সাঁওতাল ধর্মে তারা সুনির্দিষ্টভাবে কোন দিক নির্দেশনা খুঁজে পাননি। তাদের অনেক উপাসনা হিন্দুদের মতই। কিন্তু তারা হিন্দু নন। সাঁওতাল ধর্মের আদি কোন শক্তিশালী ভিত তারা খুঁজে পান নি, তাই তাদের মনে হয়েছে, তারা বোধ হয় কোন ধর্মের ভেতরই নেই'* [৪]। এই চিন্তা থেকে সাঁওতাল ধর্মের প্রতি তাদের আগ্রহ কমে আসে এবং এ সময় সুযোগ বুঝে মিশনারীরা খ্রিস্ট ধর্মের দিকে আহবান জানালে তাদের কাছে খ্রিস্ট ধর্মটি ভাল লাগে এবং খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে।

এমন অনেকেই আছেন, যারা পাড়া প্রতিবেশী, পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজনদের দেখাদেখি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে কোনরূপ বিচার-বিবেচনা ছাড়াই। বিশেষ করে পরিবার প্রধান যখন খ্রিস্টান হয়েছে, তখন ঐ পরিবারের প্রায় সবাই খ্রিস্টান হয়েছে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে।

সাঁওতাল মহিলারা তাদের স্বামী ও পিতা বা অভিভাবকদের সাথে খ্রিস্টান হয়েছেন। তবে প্রধানত শিক্ষার বিস্তার, উন্নত জীবন যাপনের নিশ্চয়তা ও আকাংখা

www.pathagar.com

এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কারণে আদিবাসীরা খ্রিস্টান হচ্ছে। আর সার্বিক ধর্মান্তর কার্যক্রমের পশ্চাতে রয়েছে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রচারণা ও সেবামূলক কর্মসূচী। মিশনারীরা তাদের মাঝে ধর্ম প্রচার করতে যেয়ে তাদেরকে নানাবিধ আর্থিক সুবিধা দিচ্ছে। খ্রিস্টান মিশনারীদের কল্যাণে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার কারণেই বরেন্দ্র অঞ্চলের সাঁওতালরা ব্যাপকভাবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করছে। বলা যায়, মিশনারীরা এদের খ্রিস্টান বানাচ্ছেন আদর্শের জোরে নয়, জড়বাদী বুদ্ধির জোরে, নানা প্রকার ঐহিক প্রলোভনের মাধ্যমে[৫]। ফলে খ্রিস্টান মিশনগুলি রাজশাহী অঞ্চলে তাদের কাজের পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে; ১৮৮১ সালে রাজশাহী জেলায়[৬] খ্রিস্টান সংখ্যা ছিল মাত্র ১২১ জন। ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৫২৯ জনে, ১৯৬১ সালে ৮৩০৩ জন[৭]। ১৯৭৪ সালে দিনাজপুর ক্যাথলিক মিশন কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত অন্য আরেক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে দিনাজপুরে ১৩১৭৮ জন, রংপুরে ১১৪০০ জন, বগুড়ায় ১০৩৯৬, রাজশাহীতে ৮১৩১ জন এবং পাবনায় ৬৮৮৫ জন ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান ছিল। এর মধ্যে অবশ্য সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাওঁ রাজবংশী, পাহাড়িয়া, মাহালী, পাহান, মাহাতো এমন কি নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকও আছে[৮]।

প্রতিটি সাঁওতাল পল্লী ধর্মীয় কারণে আজ দ্বিধা বিভক্ত। একদল সনাতন বিশ্বাসী সাঁওতাল। অন্যদল নব্য খ্রিস্টান সাঁওতাল। প্রায় প্রতিটি সাঁওতাল পল্লীতে গীর্জা নির্মিত হয়েছে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার দেওপাড়া ইউনিয়নের একটি সাঁওতাল পল্লীর একটি গবেষণা চিত্র এখানে উল্লেখ করা যায়। পল্লীটিতে ১৩২টি সাঁওতাল পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৬৭৮ জন। জরীপে দেখা গেছে তাদের মধ্যে চিরায়ত সাঁওতাল এখন ৪৩৪ জন অর্থাৎ ৬৪% আর খ্রিস্টান হয়েছে ২৪৪ জন অর্থাৎ ৩৬%[৯]। এই চিত্র অন্যান্য সাঁওতাল বসতিতেও লক্ষ্যণীয়।

ধর্মান্তরের প্রভাব

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থা ও ব্যক্তিগণের অব্যাহত কর্মকান্ডের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এ দেশে অতি দ্রুত খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতিতে এর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের আলোচ্য রাজশাহী জেলায় মিশনারী কর্মকান্ডের ফলে একদিকে যেমন খ্রিস্টান জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, তেমনি গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি, আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার আকাংখাবোধ জাগ্রত হতে শুরু করেছে। এর পাশাপাশি মিশনারী কর্মসূচীর ফলে উপজাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিও চরমভাবে চ্যালেঞ্জ এবং ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। রাজশাহী জেলায় খ্রিস্টান মিশনারী কর্মকান্ডের ফলে প্রধান প্রভাবসমূহ আলোচনা করা হলো:

www.pathagar.com

খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধি

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে কাজ করার প্রত্যক্ষ ফলাফল হলো দেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যার বৃদ্ধি। মূলত এটি মিশনারী কর্মকান্ডের প্রত্যক্ষ ফলাফল। মিশনারী উইলিয়াম ক্যারী, উইলিয়াম এ্যাডাম প্রমুখদের শুরু করা ধর্মান্তর পদ্ধতি, খ্রিস্টান সম্প্রদায় যাকে বলে বাপ্তিস্ম(Baptistsm)[১০] প্রদান, এখন কার্যকরীভাবে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বাংলাদেশে এখন মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং তার পরই খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের স্থান। তবে ধর্মীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে এদেশে খ্রিস্ট মন্ডলী সম্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছেন। এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে এদেশের জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ খ্রিস্টান হয়ে যাবার কারণে।

ইংরেজ আমলে ১৮১৩ সালের সনদ আইনের মাধ্যমে এদেশে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এর দশ বছরের মাথায় ১৮২২ সালের হিসেবে দেখা যায় এদেশের ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০৩ জনে[১১]। সেই থেকে এদেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। ১৯৪১ সালে বাংলায় খ্রিস্টান সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১১ হাজার ৪২৬ জন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে ১৯৫১ সালে খ্রিস্টান সংখ্যা ছিল ১০৬৫০৭ জন এবং ১৯৬১ সালে তা দাঁড়ায় ১৪৮৯০৩ জনে[১২]। অবশ্য এই সংখ্যার মধ্যে এদেশে বসবাসকারী ইউরোপীয়রাও ছিল। শিক্ষার বিস্তার, আর্থিক সাহায্য কিংবা চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি যাবতীয় কর্মকান্ডের মূলে মিশনারীদের যে উদ্দেশ্যটি সক্রীয় ছিল, তা হলো তাদের ধর্ম প্রচার ও প্রসার। এজন্য তারা অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে এদেশের অশিক্ষিত, গরীব আদিবাসীদের মাঝে কাজ করেছেন। ১৯৫১ সালে রাজশাহী জেলায় ইংল্যান্ড থেকে আগত প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারী *রেভারেন্ড ব্রায়ান ডসন* তার স্মৃতিচারণে বলেছেন,

ঐ গ্রামে (বেলঘরিয়া, রাজশাহী) *আমরা একটা পুরনো আর্মি তাবুতে থাকতাম এবং গোয়াল ঘরে প্রার্থনা করতাম। ... ... এখনও আমার খুব আনন্দ লাগে, যখন শুনি যে, রাজশাহী জেলায় খ্রিষ্টান সাঁওতাল সম্প্রদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে*[১৩]।

তাদের এরূপ কর্ম প্রচেষ্টা তখনই সফল হয়, যখন আদিবাসীরা যীশুর প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর জীবনাদর্শ গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা নেয়। অবশ্য ধর্মান্তরিত হওয়ার সময় দেখা গেছে সাধারণত পরিবারের কর্তা ব্যক্তিটি খ্রিস্টান হবার সাথে পুরো পরিবারটিকেই খ্রিস্টান করে নেয়া হচ্ছে। পরিবারের মহিলা সদস্য ও ছেলে-মেয়েরাও দীক্ষিত হয়ে যায়। তাদের মতামত কিংবা মনোভাবের বিষয়টি হয়ে যায় গৌণ।

www.pathagar.com

ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান পরিবারের মহিলা ও ছোট ছেলে-মেয়েদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলার সময় তাদের মতামত হল, *স্বামী কিংবা বাবা খ্রিস্টান হয়েছে তাই আমরাও হয়েছি। আমরা তাছাড়া আর কি করব ?*

ফলে দেখা গেছে, একজন খ্রিস্টান হবার সাথে সাথে পুরো পরিবারই খ্রিস্টান হয়ে যায়। এভাবে অতি অল্প সময়ে বাংলাদেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যা ও তার ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য করলে বিষয়টি আরও পরিস্কার হবে।

সারণি ১

১৯৫১-১৯৬১ পর্যন্ত বাংলাদেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যাঃ[১৪]

সাল	খ্রিস্টান সংখ্যা
১৯৫১	১০৬৫০৭
১৯৬১	১৪৮৯০৩

বাংলাদেশের সব স্থানে কিংবা সব জেলায় খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থাগুলি সমানভাবে কিংবা সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ করেনি। মিশনারীরা টার্গেট হিসেবে নির্ধারণ করেছে এদেশে উপজাতীয় লোকদের, নিম্নবর্ণের মানুষদের এবং সর্বোপরি অভাবগ্রস্তদের, কোন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের (যেমন, কুষ্ঠ রোগী)। সে দিক বিবেচনায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের উপজাতীয় লোকজন, দেশের মধ্য অঞ্চলের (গারো পাহাড় অঞ্চলের) উপজাতীয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতীয়রা মিশনারীদের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে এবং এসব জেলায় অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে খ্রিস্টান জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি জেলার খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা চিত্র উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

www.pathagar.com

১৮৮১ সাল থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত কয়েকটি জেলায় খ্রিস্টান জনসংখ্যা ও তার বৃদ্ধিঃ[১৫]

সারণি ২

জেলা	বিভিন্ন সালে খ্রিস্টান জনসংখ্যা					
	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
ঢাকা	৮৭৯৯	১০৪৭৬	১১৫৫৬	১৩১৯৪	১৩৩৭৭	১৪২১০
রাজশাহী	১২১	১০৫	৩৫১	৩২৩	১০০০	১৫২৯
দিনাজপুর	৪৫৭	৫১১	৭৭৯	১৯৬৪	৫০০৯	৬৯৮৯
রংপুর	৮৬	৩৪৩	৪৫৩	৫৯৯	১১১৪	১৬৮৬
ময়মনসিংহ	১৫১	২১১	১২৯১	২১৮১	৪১২৩	১০৭৬৪
বগুড়া	২৭	১৫	৪০	১৬১	৪০১	৪৭৬
বাকেরগঞ্জ	৩৭১৭	৪৬৫৯	৫৫৯১	৬৫৪১	৭৫৭৪	৮৯৩৫
ফরিদপুর	২৭৪১	৩৫৩৯	৪৬৪১	৫৮১০	৬২৯৯	৭৫৩৭
চট্টগ্রাম	১০৫৫	১১৯১	১২৩৭	১৪৩০	১৩৬১	১৬০৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৫৯	১৮	২৫২	১৭২	৬৬১	৭৫৯
খুলনা	৭৭৪	৯৬৩	১২৭৫	১১৯৩	১২১৭	২৪৬৭

www.pathagar.com

উপরের টেবিল থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের জেলা সমূহের মধ্যে যে কয়টিতে খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ব্যাপক, তার মধ্যে রাজশাহী অন্যতম। রাজশাহী জেলায় বসবাসরত আদিবাসীরা খ্রিস্টান মিশনারীদের টার্গেটে পড়ে ব্যাপকভাবে খ্রিস্টান হয়েছেন। ১৯৮৫ সালের এক হিসেব থেকে জানা যায়, রাজশাহী জেলায় ১ লাখ ২০ হাজার আদিবাসীর বসবাস। এরা মিশনারীদের সংস্পর্শে আসার কারণে ধর্মান্তরিত হয়ে যায় এবং সে কারণেই রাজশাহী জেলায় খ্রিস্টান জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত রাজশাহী জেলায় খ্রিস্টান জনসংখ্যার চিত্র নিম্নরূপ :

সারণি ৩

১৯৩১-১৯৮১ সাল পর্যন্ত রাজশাহী জেলায় খ্রিস্টান জনসংখ্যাঃ[১৬]

সাল	খ্রিস্টান সংখ্যা
১৯৩১	১,৫২৯
১৯৫১	৫,০৩৭
১৯৬১	৮,৩০৩
১৯৭৪	৮,১৩১
১৯৮১	১৯,৫৭১

সাবেক রাজশাহী জেলার ৪টি মহকুমার ৩০ টি থানার উপরোক্ত তথ্যের মাধ্যমে খ্রিস্টান জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে। জেলার হেড কোয়ার্টার হিসেবে রাজশাহী সদর জেলা, যা বর্তমান রাজশাহী, এখানে সূদীর্ঘকাল ধরেই খ্রিস্টান মিশনারীদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত ছিল। রাজশাহীর পদ্মা নদীর ধারে অবস্থিত বড়কুঠি প্রাঙ্গনে ইংরেজ তথা খ্রিস্টানদের সমাধি আছে। এসমস্ত সমাধির শিলালিপিতে অধিকাংশ সমাহিতদের দেখা যায়- উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, অর্থাৎ ১৮০৬, ১৮০৮, ১৮২৬ প্রভৃতি সালে[১৭], যা রাজশাহীতে খ্রিস্টান ইতিহাসের সূদীর্ঘকালকেই চিহ্নিত করে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী, তানোর, বোয়ালিয়া, মোহনপুর প্রভৃতি থানায় বসবাসরত আদিবাসী ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মিশনারী কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়েছিল। ফলে রাজশাহী সদর মহকুমা তথা বর্তমান রাজশাহী জেলায় খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপকভাবে। এ প্রসঙ্গে রাজশাহী জেলার খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে।

www.pathagar.com

সারণি ৪

১৯৬১ - ১৯৯১ পর্যন্ত রাজশাহী সদর মহকুমা বা বর্তমান রাজশাহী জেলায় খ্রিস্টান জনসংখ্যা [১৮] ঃ

সাল	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১
খ্রিস্টান সংখ্যা	২,৩৭২	২,২৬৯	৪,৭৪৬	১০,১৯১

উপরের সারণি থেকে দেখা যায়, ১৯৬১ সালে রাজশাহী জেলায় খ্রিস্টান জনসংখ্যা ছিল ২৩৭২ জন, ১৯৯১ সালে এসে মাত্র ৩০ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১০,১৯১ জন।

রাজশাহী জেলার মধ্যে সব চেয়ে বেশী ধর্মান্তরিত হয়েছে গোদাগাড়ী, বোয়ালিয়া (সদর থানা) ও তানোর থানায়। এই তিন থানায় বিগত দিনের খ্রিস্টান জনসংখ্যা ও তার বৃদ্ধি নিম্নরূপ-

সারণি ৫

১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত রাজশাহীর ৪ টি থানায় খ্রিস্টান সংখ্যা ও তার বৃদ্ধি[১৯]

থানা	বিভিন্ন সময়ে খ্রিস্টান জনসংখ্যা	
	১৯৮১ সাল	১৯৯১ সাল
গোদাগাড়ী	১৭৮৯	৪২০১
বোয়ালিয়া	৯৭৩	১৮৩৪
তানোর	১৪১০	১৯৪৪
পবা	-	১৩২৯

রাজশাহীতে বিদেশী জনসংখ্যা

মিশনারী কর্মকান্ডের পেছনে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে, তাদের মধ্যে বিদেশী মিশনারীরাই ছিল প্রধান। রাজশাহী জেলায় খ্রিস্টান মিশনারী হিসেবে কতজন বিদেশী বসবাস করছেন তার কোন সরকারী হিসেব জানা যায়নি। তবে এই জেলায় বসবাসকারী বিদেশীদের সরকারী হিসেব থেকে জানা যায়, এ জেলায় ৯৪৩২ জন বিদেশী বসবাস করেন[২০]- যা মোট জনসংখ্যার ০.৫০ ভাগ। রাজশাহী জেলায় বসবাসরত বিদেশীদের মধ্যে ৫৪০৩ জন বসবাস করেন গ্রাম এলাকায়। শতকরা

www.pathagar.com

হিসেবে যা ৪৪.২০ ভাগ। আর রাজশাহী মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বসবাস করেন ৪০২৯ জন বিদেশী নাগরিক।

আর, একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এই বিদেশীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বসবাস করছেন এদেশে খ্রিস্টান মিশনারী হিসেবে ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য।

উপরোক্ত পরিসংখ্যানসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ তথা বিশেষ করে রাজশাহী জেলায় ব্যাপকহারে খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচেছ, যা খ্রিস্টান মিশনারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরন্তর সেবা, তাদের প্রচেষ্টা ও প্রচারের ফলে সম্ভব হয়েছে।

হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী ও সনাতনপন্থী আদিবাসী সম্প্রদায়ের অগণিত মানুষ এ অঞ্চলে কর্মরত খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় খ্রিস্টান হয়েছে। এদের সবাই যে নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান হিসেবে খ্রিস্ট ধর্ম পালন করছেন কিংবা সবাই যে মিশনারীদের প্রচারিত যীশুকে তাদের ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করেছেন এমন নয়। তবে নিজেকে একজন খ্রিস্টান হিসেবে পরিচয় দিচেছ-এটাই মিশনারী কর্মকান্ডের বড় সফলতা।

শিক্ষার বিস্তার

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মিশনারীদের তৎপরতায় বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বহুলাংশে উপকৃত হয়েছে। ১৮১৩ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন সনদ আইন প্রবর্তন করে তখন থেকেই মিশনারী কর্মকান্ডের সাথে শিক্ষার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়। ঐ সনদ আইনের একটি ধারায় ভারতে শিক্ষার জন্য ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দানের কথা বলা হয় এবং এ দায়িত্ব অর্পিত হয় খ্রিস্টান মিশনারীদের উপর। এর ফলে শিক্ষা কেন্দ্র খোলা ও পরিচালনা করা মিশনারীদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হয়ে পড়ে। ১৮১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত ৩৬টি মিশনারী স্কুল চালু হয়। এ সব স্কুলে ২৬৯৫ জন বালক অধ্যয়ন করে। কলিকাতার প্রথম বিশপ থমাস ফাঁসোয়া মিডলটন (Thomas Fanshawa Middleton) ১৮২০ সালে শিবপুরে প্রতিষ্ঠা করেন বিশপ কলেজ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার এই ধারা অব্যাহত থাকে এবং একের পর এক মিশনারীদের হাতে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা হতে থাকে।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশেও এরকম বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হলো ১.সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা; ২. সেন্ট জোসেফ স্কুল, ঢাকা ও দিনাজপুর; ৩. হলিক্রস কলেজ, ঢাকা; ৪. নটরডেম কলেজ, ঢাকা; ৫. আর্চ

www.pathagar.com

বিশপ কলেজ, কলিকাতা; ৬. AUSB বিশ্ববিদ্যালয়, কালিয়াকৈর, গাজীপুর ও ৭. মিশন গার্লস হাইস্কুল, কোর্ট, রাজশাহী ।

মিশনারীদের শিক্ষা কার্যক্রমে দুটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। যথা;

এক. যারা গরীব, অসহায়, নিম্ন শ্রেণীর, অর্থাভাবে পড়তে যেতে পারে না। কিংবা যারা নিম্ন জাতের হিসেবে মনে করার কারণে অন্য সবার সাথে একত্রে স্কুলে যেতে সাহস করে না - এমন জনগোষ্ঠীর মাঝে তারা শিক্ষার একটা বৈপ্লবিক ধারণা তৈরী করে দিতে পেরেছে। সাঁওতাল, ওরাওঁ, গারোসহ আদিবাসীদের মধ্যে এখন যে আধুনিকতার ছোঁয়া - তার পুরোধা কিন্তু খ্রিস্টান মিশনারীরা। সনাতন সাঁওতালদের চেয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণকারী সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি বেশী আগ্রহ।

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার দেওপাড়া ইউনিয়নের একটি সাঁওতাল পল্লীতে এক জরিপে দেখা গেছে, এখানে চিরায়ত সাঁওতাল সন্তানদের চেয়ে খ্রিস্টান সাঁওতালদের সন্তানরা অধিকহারে স্কুল-কলেজগামী[২১]। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও একই রকম অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ মিশনারীদের শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে এদেশের দরিদ্র সমাজ, বিশেষভাবে আদিবাসীরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে, শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ বেড়েছে।

দুই. শিক্ষার গুণগত মান পরিবর্তনে মিশনারীদের একটা বিরাট ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। যদিও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা রয়েছে। কিন্তু খ্রিস্টান মিশনারীদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে ধরণের শিক্ষা নীতিমালা (কারিকুলাম) অনুসরণ করা হয় তা চলমান বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে চলার মত এবং সময় উপযোগী।

মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে শিক্ষিত হয়ে বেকার থাকার সুযোগ নেই। অনেক প্রতিষ্ঠানেই পাশ করার সাথে সাথেই শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে[২২]। মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা হয়। এদেশেই আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। এক্ষেত্রে ঢাকার নটরডেম কলেজ, সেভেনথ ডে এ্যাডভেন্টিষ্ট চার্চ পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংরেজী মাধ্যম স্কুলগুলির শিক্ষা কার্যক্রম প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মিশনারীদের শিক্ষা কার্যক্রম সমালোচনারও সম্মুখীন হয়েছে বারবার। বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার কারণে অনেকবারই খ্রিস্টান মিশনারীরা সমালোচিত হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে যে, তাদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কৌশলে খ্রিস্টধর্ম ও যীশুর প্রতি সহনশীল

www.pathagar.com

মানষিকতা তৈরী করা হয়। 'সলভেশন আর্মি' নামক মিশনারী খ্রিস্টান সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিশুদের বাধ্যতামূলকভাবে খ্রিস্টধর্ম পড়ানোর এবং রবিবার দিন প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে গীর্জায় যেতে হয় বলে অভিযোগ উঠেছিল।[২৩] এমন অভিযোগ অন্যান্য বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উপরও ছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে খ্রিস্টান এনজিও সম্পর্কে জনগণের মধ্যে নানামুখী সন্দেহ ও আলেম ওলামাদের প্রতিবাদের কারণে মিশনারী স্কুল কলেজে সহনীয় পদ্ধতিতেই ধর্মীয় বিষয়গুলি দেখা হচ্ছে। গাজীপুরস্থ কালিয়াকৈর এ এ্যাডভেনটিস্ট ইউনিভার্সিটিতে প্রতিদিন সকাল ৭ টায় উপাসনা করতে হয় সকল ছাত্রছাত্রীকে। এটা বাধ্যতামূলক। যে যার ধর্ম মতে উপাসনা করে আধা ঘন্টা।

খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশের সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষ করে ১৮৩০ সালে প্রেসবিটারিয়ান মিশনারী আলেকজান্ডার ডাফ কলিকাতায় যে স্কটিশ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বাঙালী হিন্দুদের উপর এই কলেজের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। কবি মধুসুদন দত্তকে ডাফ সাহেবই খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ডাফ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম বিশেষভাবে স্থির করে দেন। এভাবে তিনি ইংরেজ আমলের শিক্ষা পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছিলেন, যার ধারা আমরা এখন পর্যন্ত কিছুটা বহন করে চলেছি [২৪]।

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি

সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, খ্রিস্টান মিশনারীরা দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। ফলে তার প্রভাব ভাল-মন্দ যাই হোক, গরীব লোকদেরই হচ্ছে। রাজশাহী এলাকায় দেখা গেছে, ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান পরিবারগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় বেশ উন্নত হয়েছে।

পূর্বে রাজশাহীর সাঁওতাল কিংবা অন্য অনেক আদিবাসী পরিবার অর্থনৈতিকভাবে খুবই কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করত। পরের ক্ষেতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নাম মাত্র মূল্যে শ্রম দিয়ে পেটের অন্ন জোগাড় করত। কাজ না পেলে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে কোন মতে জীবন বাঁচাত। সমাজে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে তাদের নিদারুন লাঞ্চনার শিকার হতে হত।

কিন্তু বর্তমান দৃশ্যপট সম্পূর্ণই ভিন্ন। হপনা হেমব্রম, লুইস লাকড়া, মাতুম মুর্ম্মু প্রমূখ ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সাঁওতাল। খ্রিস্টান হওয়ার পর তারা এখন পশ্চিম টালীপাড়ায় খ্রিস্টান পল্লীতে থাকেন। মিশনের দেয়া দু'কামরার ঘরে মোটামুটি সুখেই তারা বসবাস

www.pathagar.com

করছেন। ছেলে মেয়েরা পার্শ্বের মিশন স্কুলে (মুক্তিদাতা বেসরকারী জুনিয়র হাইস্কুল) পড়াশুনা করে।

এমনিভাবে রাজশাহীর সাঁওতাল পল্লী ডিঙ্গডোবা, মহিষবাথান কিংবা পূর্ব মোল্লাপাড়ার খ্রিস্টান সাঁওতালদের চেহারায় পরিতৃপ্তি আর সুখের অভিব্যক্তি দেখা যায়। সবাই কিছু না কিছু কাজ করছে। কেউ বসে নেই। মেয়েরাও বরেন্দ্র অঞ্চলে মাঠে কাজ করতে যাচেছ। বাচ্চারা স্কুল কলেজে পড়াশুনা করছে। মিশনের পক্ষ থেকে দেয়া ঘর বাড়ী আছে। প্রাচীর ঘেরা নিরাপদ এলাকায় তাদের বাড়ী। কারো আক্রমন কিংবা বড় ধরণের চুরি ডাকাতি বা নির্যাতনের ভয় নেই। এমনি এক অনাবিল শান্তিময় পরিবেশে খ্রিস্টান সাঁওতালরা বাস করছে।

এ প্রসঙ্গে রাজশাহীর বিভিন্ন এলাকায় সরেজমীন পর্যবেক্ষণ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়ঃ

১. স্বপ্না রানী

ডিঙ্গাডোবা সাঁওতাল পল্লীর রাস্তায় হাঁটছিল সাঁওতাল কিশোরী স্বপ্না রানী ও তার বান্ধবী। তাদের দেহের রং কালো, চুল কোকড়ানো। দুজন আলাপ করছিল স্কুলের পড়া নিয়ে এবং কোচিং সেন্টারে পড়া সম্পর্কে। তাদের সাথে আলাপ করে জানা গেল দুজনই মিশন স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশুনা করে। কথায় তাদের জড়তা কিংবা অভদ্রতার ছাপ নেই। স্বপ্নার ইচছা সে পড়াশুনা করবে, অনেক বড় হবে। স্বপ্না সুন্দর একটি আগামীর স্বপ্ন দেখছে। নিঃসন্দেহে স্বপ্নাদেরকে মিশনই এই স্বপ্ন দেখিয়েছে।

২. ডেভিড ও তার বন্ধুরা

ডিঙ্গাডোবা ক্যাথলিক মিশনের সামনের চা স্টলে আড্ডা দিচিছল ৪/৫ জন যুবক। বয়স ১৫ - ২২ বছরের মধ্যে হবে। শরীরের রং, গঠন, মাথার চুল সব কিছুতেই তাদের পূর্ব পুরুষদের স্মৃতি বিজড়িত পরিচিতির ছাপ পরিলক্ষিত হয়। ছেলেগুলি বেশ স্মার্ট। তারা চা খাচেছ আর কথা বলছে। আলোচনার বিষয় - তাদের কলেজ, কখনও হিন্দি সিনেমার কোন প্রসঙ্গ কিংবা নিজেদের কোন ব্যক্তিগত বিষয় । খুব স্বাচছন্দে এবং মন খুলে কথা বলছে এই যুবকরা। পরিচয়ে জানা গেল এরা খ্রিস্টান সাঁওতাল, পড়াশুনা করে রাজশাহী কোর্ট কলেজে। এদের এক জনের নাম ডেভিড, বয়স আনুমানিক ২১, সে খ্রিস্টান সাঁওতাল।

www.pathagar.com

৩. লুসিয়া হেমব্রম

লুসিয়া হেমব্রম আদিবাসী কিশোরী। পিতাঃ হপনা হেমব্রম, বয়সঃ ১৩ বছর, পশ্চিম টালীপাড়া খ্রিস্টান পল্লী, হড়গ্রাম, রাজশাহী। লুসিয়া মিশন স্কুলে ৮ম শ্রেণীতে পড়ে। ওদের স্কুলে ৮ম শ্রেনীর পর আর পড়ার সুযোগ নেই, তাহলে লুসিয়া ৮ম শ্রেণী পাশ করার পর কোথায় পড়বে? পড়াশুনা বাদ দেবে কি? এমন প্রশ্ন করা হলে সে তার ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কথা জানায়। এখান থেকে ৮ম শ্রেণী পড়ার পর সে নাটোরের বনপাড়ায় মিশন পরিচালিত স্কুলে গিয়ে হোস্টেলে থেকে এস. এস. সি. পাশ করবে। অতপর সে নার্সিং এর উপর পড়াশুনা করে ভবিষ্যতে নার্সিংকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করবে।

এই ডেভিড কিংবা স্বপ্নাদের জীবনে পরিবর্তনের মন-মানষিকতা এনেছে মিশনারীদের কর্মকান্ড। অতীতে অনেক সাঁওতাল কিশোর কিশোরীর মতই ডেভিড-স্বপ্নারা এখন আর মাঠে ধান কুড়ায় না। গর্ত খুঁড়ে ইদুর কিংবা শামুক সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে না। পরিপাটি পোশাকে তারা অনেকটা আধুনিক জীবন অতিবাহিত করছে। এটা অবশ্যই একটি ইতবাচক দিক, প্রেরণার দিক।

সাঁওতাল পল্লী ঘুরে দেখে তাদের জীবনযাত্রায় পরিচছন্নতার স্পষ্ট চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি বাড়ীতে স্যানিটারী লেট্রিন আছে। টিউবওয়েলের পানি পান করছে তারা। ঘরের আশে পাশে শাক সবজির বাগান করেছে। অনেকের বাসায়ই টেলিভিশন আছে। বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা আছে। খুব সাজানো গোছানো সংসার তাদের।

মিশনারী কর্মকান্ডের ফলে তাদের পুরো দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের আর্থিক অবস্থা এত ভাল নয় যে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করাবে কিংবা স্কুল কলেজের খরচ বহন করবে। কিন্তু মিশনারী কমসূচীর কারণে তারা সন্তানদের বিনা খরচে পড়াতে পারছে। বর্তমানে শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ অভাবনীয়। রাজশাহীর ডিঙ্গাডোবায় একজন ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সাঁওতাকে বর্ষার দিনে সন্তানকে ঘাড়ে করে নিয়ে স্কুলে যেতে দেখা গেছে। নিজের শরীর ভিজলেও সন্তানের গা ভিজতে দিচিছলেন না তিনি। বৃষ্টি-বাদলের দিনেও বাচচাকে স্কুলে আনতে হবে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন যে, পড়ার ক্ষতি হবে, ছেলে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়বে। সে জন্য স্কুল কামাই করা যাবে না। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, খ্রিস্টান সাঁওতালরা এখন পড়ালেখার প্রতি অত্যন্ত সচেতন।

মিশনারী তৎপরতার আরেকটি প্রধান দিক হচেছ দরিদ্র জনসাধারণ তাদের কাছ থেকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যগত সেবা পাচেছ। গরীব মুসলমান, নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও আদিবাসী জনগণ অল্পমূল্যে চিকিৎসা পাচেছ। এক্ষেত্রে রাজশাহীর খ্রিস্টান মিশন হাসপাতালের অবদান স্মরণযোগ্য। অতি প্রাচীন এই হাসপাতালটি অবাণিজ্যিকভাবে

www.pathagar.com

চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচেছ। অবশ্য খ্রিস্টান মিশনারীদের এ সমস্ত সেবার সিংহভাগ ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানরাই ভোগ করে থাকে। এতদিন যারা অসুস্থ্য অবস্থায় পয়সার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারেনি, তারা মিশনের আওতায় আসার কারণে উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা পাচেছ। বাচচাদের টিকা দিচেছ সময়মত। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সচেতনতাসহ সার্বিকভাবে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের মধ্যে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। অনেক সাঁওতালের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নেশা- ধুমপান ইত্যাদির প্রচলন ছিল। বর্তমানে খ্রিস্টান হওয়ার কারণে কিংবা সামাজিক পরিবর্তনের কারণে তাদের অনেকেই এসমস্ত আদি অভ্যাস পরিত্যাগ করেছে।

জনগনের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর আঘাত

খ্রিস্টান মিশনারীদের অব্যাহত কর্মতৎপরতার প্রভাব দেশের মুসলমান, হিন্দু, আদিবাসী -সকল সম্প্রদায়ের জনগণের মাঝেই কমবেশী পড়েছে। খ্রিস্টান মিশনারীদের অবাধে কর্ম তৎপরতার কারণে যারা ধর্মান্তরিত হচেছ, তারা আর পূর্বের ধর্মাচার কিংবা সংস্কৃতিকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেনা। এর ফলে এ দেশের আদিবাসী মানুষের স্বকীয় ধর্ম-বিশ্বাস ও সংস্কৃতিই আজ বিলুপ্তির পথে এসে দাঁড়িয়েছে। যেমনঃ

সনাতন উপজাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব ঃ মিশনারীদের কারণে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছে আদিবাসীদের ধর্ম ও তাদের সংস্কৃতি। রাজশাহী জেলার সাঁওতালদের মধ্যে মিশনারীদের প্রভাব সরেজমীন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, খ্রিস্টান হওয়ার কারনে তাদের পূর্বের ধর্মমত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাদ দিয়ে তারা খ্রিস্টীয় জীবনযাত্রার আলোকে নিজেদের ঢেলে সাজিয়েছেন।

খাদ্য গ্রহণের বিষয়টি প্রথমে আলোচনা করা যাক। রাজশাহীর সাঁওতালদের মধ্যে খাবারের ব্যাপারে মুসলমান ও হিন্দু সমাজের প্রভাব আছে। যেমন, কেউ গরুর গোস্ত খাননা, আবার অনেক সাঁওতাল আছেন, যারা শুকুরের গোস্ত গ্রহণ করেন না। তবে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান পরিবারগুলিতে এসবের কোন বাছ-বিচার নেই। পোশাকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে সনাতন সাঁওতালদের চেয়ে ধর্মান্তরিত সাঁওতালরা বেশ পরিপাটি পোশাকে থাকছে। নতুন প্রজন্মের সাঁওতাল পুরুষেরা শার্ট-প্যান্ট, জুতা, ক্যাপ ইত্যাদি পরিধান করছে।

বিয়ে-শাদির ক্ষেত্রে সাঁওতালদের রীতি-নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। খ্রিস্টান সাঁওতালরা বিয়ের প্রচলিত সনাতন রীতি আর মানছেনা। তাদের বিয়ে গীর্জাতেই অনুষ্ঠিত হচেছ। অবশ্য ধর্মান্তরিত অনেক সাঁওতালই গীর্জায় বিয়ে করলেও বাড়ীতে এসে সনাতন নিয়ম কানুন পালন করে থাকে।

www.pathagar.com

ধর্মান্তরিতদের মনোভাব : সাঁওতালরা এদেশে বংশপরম্পরায় প্রতিবেশী মুসলমানদের সাথে ববসবাস করে আসছে। এই আলো-বাতাসে তারা মানুষ হচ্ছে, একই মাঠে কাজ করছে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ট প্রতিবেশী মুসলমানদের সাথে তারা আন্তরিকভাবে মেলামেশা করে না। সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমানদের ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করতেও তারা রাজী নয়। বরং মুসলমান ও ইসলাম ধর্ম, খুব বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া সাঁওতালদের কাছে প্রবঞ্চনা ও তিক্ততার প্রতীক। সাঁওতালদের সাথে নিবিড় আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, মুসলমানদের সাথে মৌখিক ভাব থাকলেও তারা মনে মনে অবজ্ঞা করে এবং যতটুকু সম্ভব মুসলমানদের এড়িয়ে চলে। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর খিস্টান সাঁওতালদের মধ্যে এই প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলমানদের জন্য এটা ভাল কোন সংবাদ নয়। সংখ্যালঘুদের সাথে সৌজন্যমূলক আরচণ করার শিক্ষা ইসলামের। সম্ভবত এক্ষেত্রে ইসলামের এই শিক্ষার কোন ছাপ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আদিবাসীরা পাননি।

রাজশাহী জেলায় আদিবাসীদের প্রতিবেশী হিসেবে হিন্দুদেরও বসবাস রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের অনেক স্থানে সাঁওতাল ও হিন্দু পল্লী একই গ্রামে, একই স্থানে। হিন্দু ধর্মের অনেক আচার-নিয়মও আদিবাসীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। প্রতিবেশী হিন্দুদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা মাঝে মধ্যে অংশ নিলেও হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে সাঁওতালরা রাজী নয় (অবশ্য হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করার কোন নিয়ম সে ধর্মে নেই)। তারা চিরায়ত সাঁওতাল ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতেই বেশী আগ্রহী। তাদের বিশ্বাস, খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করলে শিক্ষা লাভ ও চাকুরী পাওয়া যাবে, আয় উপার্জনের পথ সহজ হবে[২৫]।

ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান আদিবাসীরা খুবই অন্তর্মুখী। বাইরের সমাজের সাথে তারা তেমন একটা মেলামেশা করে না। কিন্তু ধর্মান্তরিত আদিবাসী ও খ্রিস্টান হয়নি- এমন আদিবাসীর লোকদের কাছে মিশনারীর লোকজন অত্যন্ত প্রিয় ও আস্থাভাজন। মিশনের লোকদের তারা খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তি-ভয় করে। আদিবাসীরা তাদের সাথে খুব সহজভাবে এবং খোলামেলাভাবে কথা বলে এবং খুব নিকটের মানুষ মনে করে। আর আদিবাসীরা মিশনের লোকদের ভয়ও করে খুব। তারা মনে করে, ফাদার রাগ করলে তাদের সুযোগ সুবিধা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কেননা তাদের ছোট-খাট বিচার-দরবার ফাদাররাই করে থাকেন।

রাজশাহীর পূর্ব মোল্লাপাড়ায় খ্রিস্টান সাঁওতালদের পল্লী গড়ে উঠায় সেখানকার আদি স্থানীয় বাসিন্দা মুসলমানরা ঐ পাড়ায় সংখ্যালঘিষ্ট হয়ে পড়েছেন। কিন্তু মুসলমান প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, প্রতিবেশী হিসেবে খ্রিস্টান সাঁওতালরা খুবই শান্ত-শিষ্ট। তারা কখনও ঝগড়া-বিবাদে জড়ায় না। খ্রিস্টান যুবক ছেলেরা নেশা জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার কিংবা 'কিশোর অপরাধ' জাতীয় কর্মকান্ড করে সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত করে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে প্রতিবেশী মুসলমানরা

www.pathagar.com

বলেছেন, "না, বরং খ্রিস্টান সাঁওতাল যুবকরা বেশী বেশী কর্মমুখী। তারা ওসব কিছু করলে ফাদাররা শাস্তি দেবে ভয়ে কিছু করে না"।

রাজশাহীর আদিবাসী পল্লীগুলি ঘুরে, তাদের সাথ কথা বলে দেখেছি, প্রকৃতি উপাসক চিরায়ত সাঁওতাল, ওরাওঁরা ক্রমশ তাদের ধর্মের সার্বজনীনতা ও তার অন্তর্নিহিত সত্য সম্পর্কে এক ধরনের দ্বিধা বা সন্দেহ পোষণ করতে শুরূ করেছে। এরূপ মনোভাবের পেছনে প্রধানতম কারণ মনে হয়েছে, খ্রিস্টান মিশনারীদের নিঃশব্দ অথচ ব্যাপক প্রচারণা। ফলে আদিবাসীরা তাদের পুর্ব পুরূষের ধর্ম বিশ্বাস, রীতিনীতি পরিত্যাগ করে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হচেছ। নব দীক্ষিত খ্রিস্টান সাওতালরা সামাজিকভাবে সাঁওতাল সমাজের অভ্যন্তরে একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা, ভিন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হচেছ। তাদের অভিহিত করা হচেছ "খ্রিস্টান সাঁওতাল" হিসেবে। দৈহিক বৈশিষ্ট্যে, ভাষায়, এমন কি খাদ্যাভ্যাসেও তাদের কোন মৌলিক পরিবর্তন না ঘটলেও ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে তাদের সাথে চিরায়ত সাঁওতালদের ব্যবধান ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। তদ্রূপভাবে সামাজিক দুরত্বও ক্রমবর্ধমান। তেমনিভাবে ওরাওঁ, রাজবংশীসহ অন্যান্য আদিবাসীদেরও চিরায়ত জাতি থেকে আলাদা একটি সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে পড়তে হয়েছে।

সাঁওতাল, ওরাওঁরা এদেশেরই মানুষ। হিন্দু ও মুসলমান অধ্যুসিত এলাকায়ই তাদের বাস। অথচ হিন্দু সম্প্রদায় যেমন তাদের আত্মীকরণের চেষ্টা করেনি, তেমনি মুসলমান সম্প্রদায়ও তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে সৎ সাহস দেখায়নি। তাদের মাঝে বৈষয়িক সাহায্য-সেবা নিয়ে এগিয়ে আসেনি।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের এই উপেক্ষিত মনোভাব এবং এক শ্রেণীর বাঙালী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার নিশ্চয়তা বোধ থেকে আদিবাসীরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়ে আসছে। এই প্রবণতা যদি অব্যাহত থাকে তবে এমন একদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন সনাতনপন্থী একজন আদিবাসীকেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারা ধর্মান্তরিত হচ্ছেন, সঙ্গে বিলুপ্ত হচেছ এদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল ধারা[২৬]।

হিন্দু-মুসলমান- অধ্যুসিত এই দেশেই আদিবাসীদের বসবাস। এদেশ শত শত বছর ধরে হিন্দু ও মুসলিম শাসকরা সুনাম ও সুখ্যাতির সাথে রাজত্ব করেছে। সামাজিকভাবেও আদিবাসীরা হিন্দু-মুসলমাদের সাথেই একই এলাকাতে বসবাস করে এসেছে। অথচ তারা এই দু'টি ধর্মের কোনটার প্রতিই ঝুকে পড়েনি। হিন্দু ধর্মে তো আত্মীকরণের কোন সুযোগই নেই। মুসলমানরা একটা মিশনারী জাতি হলেও বাংলাদেশের আদিবাসীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেনি মুসলমান সমাজ। শত শত বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের এই উপেক্ষিত মনোভাব আদিবাসীদের

www.pathagar.com

উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলেছে। ফলে তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের প্রতি ঝুঁকেছে। এই ধর্মান্তর তাদের নিজস্ব উৎসব-অনুষ্ঠানের ধরণ ও ধারা পাল্টে দিয়েছে। ধর্মান্তরিতরা এখন বড় দিনের উৎসব পালন করছে। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে তারা শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থ সকল ক্ষেত্রেই উন্নততর সুবিধা পাচ্ছে বটে কিন্তু তাদের সনাতন সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে।

মুসলমান সমাজের উপর প্রভাব ঃ বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ। এদেশের শতকরা ৮৬ ভাগ মানুষ মুসলমান। রাজশাহী জেলায়ও মোট জনসংখ্যার ৯২.৬৮% মুসলমান[২৭]। স্বভাবতই খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তর কার্যক্রমের অবশ্যাম্ভাবী প্রভাব এদেশের মুসলিম জনগণের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, সাহিত্য-সংস্কৃতি এমনকি ধর্মীয় অনুভূতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইতিমধ্যেই খ্রিস্টান সাহায্যপুষ্ট ও তাদের সহযোগী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার অব্যাহত কর্ম-প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে তাদের কর্ম তৎপরতা শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের সাহিত্য, দর্শন, সিনেমা, সংস্কৃতি এদেশে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তার ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষিত শ্রেনীর মুসলমানদের একটি বিরাট সংখ্যা ধর্মীয় স্বাতন্ত্রবোধ হারাচ্ছে। এখন তারা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ জীবনের প্রত্যেক বিভাগ ও স্তরে খ্রিস্টীয় তথা পাশ্চাত্য চিন্তাধারার অনুকরণে দ্বিধাহীনভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিপরীতে পাশ্চত্যের উগ্রতা দেশে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ঢাকাসহ বড় বড় শহরগুলিতে নাইট ক্লাব, পতিতালয়, বার ইত্যাদি গড়ে উঠেছে, ফলে পশ্চাত্য সংস্কৃতি আধুনিক মুসলমান সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যাকে গ্রাস করেছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিবাহ-বহির্ভূত দাম্পত্য জীবন (লিভ টুগেদার) এখন এদেশের মুসলমানদের মধ্যেও বিষক্রিয়ার মত ছড়িয়ে পড়ছে। খ্রিস্টান বিশ্বের সমর্থনপুষ্ট এক শ্রেণীর এনজিও কর্তৃক আধুনিকতার নামে ইসলামের পর্দা প্রথা ও পারিবারিক বন্ধনকে অস্বীকার করার কারণে দেশে সামাজিক অনাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মোট কথা, এমন এক সংস্কৃতির প্রচলন করা হচেছ অতি সুকৌশলে, যা এদেশের মানুষের জীবন, জাতীয়তা, ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। দেশের মুসলিম এলিট শ্রেণীর মাঝে ঈমানহারা সেক্যুলার এমন এক জনগোষ্ঠী গড়ে উঠছে, যারা নামে মাত্র মুসলমান বলে পরিচয় দিলেও প্রকৃত ইসলামকে মোটেও পছন্দ করবে না। ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস, ঐহিত্য ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে স্বয়ং মুসলমানদেরই একটি অংশকে প্রতিবাদী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এদেশে মিশনারীদের সফলতা উল্লেখ করার মত[২৮]।

www.pathagar.com

অর্থাৎ দেশের মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে সুবিধা করতে না পারলেও তাদের একটি অংশকে ইসলাম বিদ্বেষী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তারা সক্ষম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুদান, মরোক্কো, লেবানন, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের কথা উল্লেখ করা যায়। ঐ সকল দেশ মুসলিম প্রধান হওয়ার পরও খ্রিস্টান মিশনারীদের নিরন্তর প্রচেষ্টার কারণে সে সব দেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি খ্রিস্টান সম্প্রদায় আজ দেশীয় নীতি নির্ধারণে বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে এবং মুসলিম সমাজ জীবনে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া থেকে খ্রিস্টান সম্প্রদায় পূর্ব তিমুরকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। সেখানকার বিশিষ্ট খ্রিস্টান নেতা বিশপ কার্লোস বারো ও জানানা গুসামাও এর নের্তৃত্বে পূর্ব তিমুরে যে স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাতে অষ্ট্রেলিয়াসহ খ্রিস্টান বেশ কয়েকটি দেশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল। আন্তর্জাতিক খ্রিস্টান বিশ্বের চাপের মুখে ইন্দোনেশিয়া পূর্ব তিমুরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পূর্ব তিমুরের ঐ বিপ্লবী নেতাদের নোবেল শান্তি পুরস্কারও দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে লেবাননে খ্রিস্টান সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাম্প্রদায়িক দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যার জন্ম দিয়েছে।

১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পর খ্রিস্টান পন্ডিতরা এখন প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, পৃথিবীতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ভোগবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে এখন সবচেয়ে বড় বাধা হলো ইসলাম ধর্ম। তাই খ্রিস্টান বিশ্বে স্বনামধন্য পন্ডিত ও নীতি নির্ধারকরা এখন বিশ্ব রাজনীতিতে ধর্ম ও সভ্যতার ভিত্তিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের কর্মকান্ডের সার্বিক মূল্যায়ন করলে আন্তর্জাতিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পরিকল্পনা ও কর্মকৌশলের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং বল্গাহীন ভাবে বাংলাদেশে মিশনারী তৎপরতা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশও নাইরেজিয়া, সুদান, ইন্দোনেশিয়ার মত স্থায়ী সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। একই সাথে এদেশীয় আদিবাসীদের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

১.ধর্মান্তর বিষয়ে ক্যাথলিকরা বেশী জোরালো ভূমিকা পালন করেন। তারা অনেক সময় জোর করেও ধর্মান্তর করেন- এরূপ মন্তব্য করেছেনপ্রটেস্ট্যান্ট ও এ্যাডভেনটিস্টগণ। তারা নিজেরা এক্ষেত্রে নমনীয় বলে দাবী করেছেন।

২. পোপের ভারত সফর ও এতদসম্পর্কিত তাঁর বক্তব্যের জন্য দেখুন, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ ও ৬ নভেম্বর ১৯৯৯ ।

৩. প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় রেভারেন্ড সালকু মুর্মু নামক একজন ত্যাগী দেশীয় যাদারের কথা; যিনি রাজশাহীর গোদাগাড়ী থানাধীন চরিশ নগরের পাইতাপুকুর মিশনে যাদার হিসেবে কর্মরত আছেন। যাদার সালকু মুর্মু ১৯৬৫

www.pathagar.com

সাল থেকে এইগ্রামকে কেন্দ্র করে বরেন্দ্র অঞ্চলে একান্ত মনে মিশনারী দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত তিনি একাই ১৮৪ জনকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তা ছাড়াও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিশপ পৌলিনুস কস্তাসহ বেশ কয়েক জন খ্যাতনামা নিবেদিতপ্রাণ ধর্ম যাজক রাজশাহীতে নিরন্তরভাবে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারে কাজ করে যাচ্ছেন।

৪. রাজশাহীর হড়গ্রাম ইউনিয়নের সাঁওতাল পল্লীর অনেক ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সাঁওতালই এমন কথা বলেছেন। অনুরূপভাবে জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি থানার মহিপুর মিশন পাড়ার ধর্মান্তরিত সাঁওতালদেরও বক্তব্য একই রকম। দেখুন - ফরহাদ হোসেন, '*বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতা ও আমাদের সমাজ*' (ফিল্ড ওয়ার্ক প্রতিবেদন, শিক্ষা বর্ষ ১৯৯৫-৯৬),সমাজ কর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.৩৯।

৫. এবনে গোলাম সামাদ, *রাজশাহীর ইতিবৃত্ত* রাজশাহী, ১৯৯৯, পৃ. ৭৫।

৬. বর্তমান রাজশাহী, নওগা, নাটোর ও নবাবগঞ্জসহ বৃহত্তর রাজশাহী জেলা।

৭. সেনসাস অব ইন্ডিয়া ১৯৩১, ভল্যুম ৫, কলিকাতা, ১৯৩৩ পৃ. ৪০৭-৪১২ ও রাজশাহী জেলা গেজেটিয়ার ১৯৭৬।

৮. আব্দুল জলিল,প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

৯. আব্দুর রশিদ সিদ্দিকী, 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণের প্রকৃতি : সাঁওতাল উপজাতি সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ', অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৭।

১০.কেউ খ্রিস্ট ধর্মগ্রহণ করতে চাইলে কিংবা কাউকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দিতে হলে সে কিশোর কিশোরী হলে গায়ে পানি ছিটিয়ে, আর বয়স্ক লোক হলে পুকুরে গোসল করিয়ে তাকে পবিত্র যীশুর শিষ্য করে নেয়া হয়। এই প্রক্রিয়াকে খ্রিস্টান সমাজ বলেন 'বাপ্টিস্ম' দেয়া।

১১. কে পি সেন গুপ্ত,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

১২. আদম শুমারি রিপোর্ট, ১৯৬১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

১৩.ব্রায়ান ডসনের শুভেচ্ছা বাণী, সাঁওতাল মন্ডলীর সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা,প্রাগুক্ত।

১৪. ১৯৬১ সাল থেকে ২০০০ সালের জনসংখ্যার রিপোর্ট সমূহের ক্যালকুলেশন।

১৫. সেন্সাস অব ইন্ডিয়া ১৯৩১, ভল্যুম ৫, কলিকাতা, ১৯৩৩ পৃ. ৪০৭।

১৬. ১৯৩১-১৯৮১ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত জনসংখ্যা রিপোর্টসমূহের আলোকে তৈরীকৃত।

১৭. কাজী মোঃ মেছের, রাজশাহীর ইতিহাস (১ম খন্ড), কাজীপ্রকাশনী, বগুড়া,১৯৬৫, পৃ. ২১।

১৮. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত আদম শুমারি রিপোর্ট- ১৯৬১, ১৯৭৪,১৯৮১ এর আলোকে তৈরীকৃত।

১৯. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত আদম শুমারি রিপোর্ট- ১৯৮১, ১৯৯১ এর আলোকে তৈরীকৃত।

২০. ১৯৯১ সালের আদম শুমারি রিপোর্ট, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

২১. সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*।

২২. এই সংখ্যাটি খুবই কম। শুধুমাত্র যারা ধর্মান্তরিত হয় তারাই এই সুবিধা পেয়ে থাকে।

২৩. দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৯শে জুলাই, ১৯৯২।

২৪. এবনে গোলাম সামাদ, রাজশাহীর ইতিবৃত্ত,প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

২৫. আব্দুর রশিদ সিদ্দিকী, 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহনের প্রকৃতি: সাঁওতাল উপজাতি সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ', অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৭।

২৬. আব্দুল জলিল,প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

২৭. জনসংখ্যা রিপোর্ট, রাজশাহী জেলা, ১৯৯১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

২৮. মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, বাংলাদেশ: এনজিও উপনিবেশবাদের দূর্ভেদ্য জালে, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ.৭২ ।

www.pathagar.com

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

ধর্মীয় গ্রন্থ

সম্পাদকের নাম	গ্রন্থের নাম
সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী	তাফহীমুল কোরআন (বাংলা অনু), ৮ম খন্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।
,,	তাফহীমুল কোরআন(বাংলা অনু), ১২শ খন্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।
মুফতী মুহাম্মদ শফী	মারেফুল কোরআন, বাংলা অনু- মুহিউদ্দিন আহমেদ,
নূর মোহাম্মদ আজমী	মেশকাত শরীফ, ১ম খন্ড, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ।
সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী	সীরাতে সরওয়ারে আলম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।
,,	খতমে নবুয়াত, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।
বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি	পবিত্র বাইবেল (পুরাতন ও নতুন নিয়ম), ঢাকা।
,,	হযরত লুকের লেখা ইঞ্জিল শরীফ, ঢাকা, ১৯৯৯।
-	বার্ণাবাসের বাইবেল, আফজাল চৌধুরী অনুদিত, ঢাকা, ১৯৯৬।

সাধারণ গ্রন্থাবলী

আবদুল জলিল : বাংলাদেশের সাঁওতাল: সমাজ ও সংস্কৃতি । বাংলা একাডেমী, ১৯৯১ ।

,, : উত্তরবঙ্গের আদিবাসী : লোকজীবন ও লোকসাহিত্য, - ওরাওঁ, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ১৯৯১।

মাহবুবুল হক : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা, ১৩৮৩ বাং।

শ্রী সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ইস্টার্ণ পাবলিসার্স, কলিকাতা, ১৩৭৭ বাং।

হুমায়ুন আব্দুল হাই : মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬।

বদরুল আলম খান : বাংলাদেশ: ধর্ম ও সমাজ, সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, চট্রগ্রাম, ১৯৮৮।

www.pathagar.com

সিরাজুল ইসলাম	:	বাংলাদেশের ইতিহাস (তিন খন্ডে), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩।
আবুল মাল আব্দুল মুহিত	:	বাংলাদেশ পূনর্গঠন ও জাতীয় ঐক্য, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯১।
ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার	:	দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্ (আব্দুল মওদুদ অনুদিত), বাংলা একাডেমী, ১৩৭০ (বাং)।
মাহবুব হাসান	:	বাংলাদেশঃ প্রকৃতি ও সম্পদ, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
বিহারী লাল সরকার	:	তিতুমীর বা নারকেল বাড়ীয়ার লড়াই, কলিকাতা, ১৩০৪ (বাং)।
আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	:	শহীদ তিতুমীর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৮ (বাং)।
এবিএম নুরুল ইসলাম	:	বাংলাদেশে অমুসলিম মিশনারীদের তৎপরতা, সিসকো, ঢাকা, ১৯৮৫।
মোয়াজ্জেদ্দীন হামিদী	:	খ্রিস্টান মিশনারীদের অশুভ পায়তারা, হামিদপুর,খুলনা, ১৩৭৪ (বাং)।
যোয়াকিম খালকো	:	উরাও আদিবাসী রীতি নীতির ক্যাথলিক রূপায়ন, অনু - অরুন খালকো, বলদীপুকুর, রংপুর, ১৯৮১।
আব্দুস সাত্তার	:	আরণ্য জনপদে, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৫।
,,	:	আরণ্য সংস্কৃতি, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬।
,,	:	গারোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০।
,,	:	উপজাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৯।
নূরুল ইসলাম মনজুর	:	রামমোহন রায় ও তৎকালীন বাংলার সমাজ, সমতট প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০।
মাখন লাল চৌধুরী	:	ভারতবর্ষের ইতিহাস (৩য় খন্ড), প্রকাশ মন্দির প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা।
কাজী মোঃ মিছের,		রাজশাহীর ইতিহাস (১ম খন্ড), কাজী প্রকাশনী বগুড়া, ১৯৬৫।
,,	:	রাজশাহীর ইতিহাস (২য় খন্ড), কাজী প্রকাশনী বগুড়া, ।
রমেশচন্দ্র মজুমদার	:	বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খন্ড, প্রাচীন যুগ), কলিকাতা, ১৩৫২ (বাং)।
,,	:	বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খন্ড, আধুনিক যুগ), কলিকাতা, ১৩৮১ (বাং)।
দীনেন্দ্র কুমার রায়	:	সেকালের স্মৃতি, কলিকাতা, ১৩৯৫ (বাং)।

www.pathagar.com

এবনে গোলাম সামাদ	:	রাজশাহীর ইতিবৃত্ত, প্রীতি প্রকাশনী, রাজশাহী, ১৯৯৯।
আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ	:	ইসলামাবাদ, সম্পাদনা- সৈয়দ মুর্তজা আলী, বাঙলা একাডেমী, ১৯৬৪।
মুনতাসির মামুন	:	বিশপ হেবারের চোখে বাংলাদেশ, সুবর্ণ প্রকাশন, ১৯৭৪।
সত্যেন সেন	:	মশলার যুদ্ধ, প্রকাশ ভবন, ৫. বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৩৭৫ (বাং)।
সুনীলকুমার চট্টোপধ্যায়	:	বাংলার নবজাগরনে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন, রত্না প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৪।
সুধীর কুমার মিত্র	:	হুগলী জেলার ইতিহাস (৩য় খন্ড), কলিকাতা, ১৯৬৮।
মুহাম্মদ সিদ্দিক খান	:	বাঙলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী যুগ, কলিকাতা, ১৯৬২।
ডঃ কামাল সিদ্দিকী	:	বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্রঃ স্বরূপ ও সমাধান, ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৮।
ইসতিয়াক সাঈদ	:	গ্রামীন বিত্তহীন মানুষের ইতিবৃত্ত, প্রজন্ম (মাসিক), মার্চ, ১৯৯০।
মু. আব্দুল হামিদ	:	পল্লী উন্নয়ন বাংলাদেশে, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৮।
আবুল কাশেম	:	বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২।
কাজী আনওয়ারুল হক	:	তিন পতাকার তলে (অনু- নূরুল ইসলাম খান), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২।
আব্দুল মওদুদ	:	মুসলিম মনীষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৪।
গোলাম মুরশিদ	:	রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া, নারী প্রগতির একশ বছর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।
মোহাম্মদ আজরফ	:	ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।
	:	দীনিয়াত, সম্পাদনা কমিটি কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫।
ইমাম গাযালী (র.)	:	মিনহাজুল আবেদীন, অনুবাদ মওলানা মুজীবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৬৯।
এবনে গোলাম সামাদ	:	ইসলামী শিল্পকলা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৮।
,,	:	রাজশাহীর ইতিবৃত্ত, প্রীতি প্রকাশনী, ১৯৯৯।
মেহরাব আলী	:	দিনাজপুরের আদিবাসী, আদিবাসী সংস্কৃতি একাডেমী, দিনাজপুর, ১৯৮৫।

www.pathagar.com

সুপ্রকাশ রায়	:	ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ২য় সং. কলিকাতা,১৯৭২।
পিয়ার বেছানে	:	পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি, অনুবাদ- অধ্যাপিকা সুফিয়া খান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭২।
এনামুল হক	:	মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৫।
এনামুল হক জাল্লাবাদী	:	এনজিও ষড়যন্ত্রের কবলে বাংলাদেশ, নাছিমা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৯।
মোহাম্মদ গোলাম রসুল	:	সমাজ ও সভ্যতার ইতিকথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭।
লুইজি পিমে পিনোস	:	উত্তরবঙ্গে ক্যাথলিক মন্ডলীর শুভ সূচনা ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ, আসাদ এভিনিউ, ঢাকা, ১৯৯৬।
আসগর হোসেন	:	অভিসপ্ত এনজিও এবং আমাদের ধর্ম স্বাধীনতা ও নারী, প্রীতি প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৭।
রুহুল আমীন	:	বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের তৎপরতা, ঢাকা,১৯৮৪।
-	:	বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, রাজশাহী, ১৯৯৮।
-	:	ইসলামিক বিশ্বকোষ (৫ম খন্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
মুহাম্মদ নুরুজ্জামান	:	বাংলাদেশঃ এনজিও উপনিবেশবাদের দূর্ভেদ্য জালে, ঢাকা, ১৯৯০।

ইংরেজী গ্রন্থাবলী

A. R. Mallick.	British Policy and the Muslims of Bengal, Dhaka,1961.
Alan Necly	Christian Mission : A cash study approach, Orbit books, New York, 1981.
A. Yusuf Ali.	A Cultural History of India during the British period. Bombay, 1940.
M. Mohar Ali.	The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities, (1833-1857), Chittagong, 1965.
A.N. Basu	Report on Education by Adam, London,1941.
B.D. Basu	Rise of Christian power in India. Calcutta.
,,	History of Education in India under the East India Company, Calcutta, 1935.

www.pathagar.com

P. N. Bose : A History of Hindu Civilization During British Rule, Vol.I, London, 1975.

C.Buchanan : Christian Research in Asia, London, 1811.

Carey. Esther : Missionary in India. London, 1857.

Cary. Eustace : Supplement to the Vindication of the Calcutta Baptist Missionaries. London, 1831.

Cary. S. P. William Carey. (8th ed.), London, 1934.

Chatterton. E. History of the Church of England in India since the early days of the East India Company. London,1924.

David W.B. A study of Missionary policy and methods in Bengal 1793-1905. Unpublished Ph.D. thesis, Edinburgh, 1942.

E. Daniel Potts. British Baptist Missionaries in India (1793-1837). The History of Serampore and its mission. London,1957.

Edited The Life and Letters of the Right Honorable Priedrick Max Muller. Edited by his wife. Vol. I - II. London, 1903.

Gibbs. M. E. A History of the Anglican Church in India. Delhi, 1971.

Hough. J The History of Christianity in India, Vol-1-5, London, 1845.

Huizinga. H. Missionary Education in India. Calcutta, 1909.

Hussain. A. Birth of Bangladesh: Political Role of Missions. London (Islamic Foundation), 1981.

Islam . Syed Serajul Impact of Technology and NGO on Social Development: A case study of Bangladesh, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, vol. xxI. No-2, 1998.

J. C. Marchman Life and Times of Carry, Marshman and Word. Vol. I, Londom, 1859.

www.pathagar.com

Life and Times of Carry, Marshman and Word. Vol.II, London,1859.

K. M. Panikkan. India and The Indian Ocean. London, 1945.
Khan. Abdul Karim Christian Missions in Bangladesh: A survey, London, 1981.
L. W: Peckett. Christian Mass Movement in India, Lukhnow publishing house, Delhi, 1969.
Larid, Michael. Missionaries and Education in Bengal (1793-1837), Oxford, 1972.
Loveti R. The History of the London Missionary Society 1795-1895.2 Vols. London1899.
Nehru. J. : The Discovery of India, Calcutta, 1946.
Oddie. G. A. : The Rev. James Long and Protestant Missionary Policy in Bengal (1840-1872), Ph D Theses, London, 1964.
Philips. C. H. The East India Company. 1940, 1961, Manchester.
Richter. J. A History of Missions in India. Edinburgh 1908.
Romesh Dutta. The Economic History of India in the Victory Age, London, 1901.
Smith, George Life of William Carrey, London, 1935.
Stock. E. The History of the Church Missionary Society 4 Vols. London 1899.
Street A.W. Bishop's College and its Mission.Calcutta.1842.
Susan Doram. Elizabeth-1st And Religion (1558-1603). New York, 1994.
Tailor. James. A Sketch of the Topography Statistics of Dacca, Calcutta, 1840.
Underwood. A.C. A History of Baptists.London.1947.
Vidlar. A. R The Church in an age of Revolution. London, 1961.
Warren. M.A.C. Social History and Christian Mission. London, 1967.
Weitbrecht. J. J. Protestant Missions in Bengal. London,1844.

www.pathagar.com

Whitley.W.T. A History of British Baptists. 2nd. ed. London1839.

বিভিন্ন জনসংখ্যা রির্পোট

Beverley, H. Report on the Census of India, 1872, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1872

Bowedellon, J.D Report on the Census of Bengal. 1881, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1883.

Donnell,C.J.O Census of Lower Provinces of Bengal 1881, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1893.

Government of Bengal Report on the Census of District of Rajshahi, 1891, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1893.

Gail, E.A. Census of India 1901.Vol.VI, Part- I, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1902.

- : Rajshahi District Census Report 1891,

- : Census of India,1931,Vol.V, Calcutta, 1933.

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান- ১৯৭৪, রাজশাহী জিলা, ঢাকা, ১৯৭৪।

Bangladesh Statistical Burrow Rajshahi District Census Report, 1974, Dhaka.

Do. Rajshahi District Census Report, 1981, Dhaka.

Do. Rajshahi District Census Report, 1991, Dhaka.

Do. Statistical Pocket Book of Bangladesh. 1996.

www.pathagar.com

অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন

আব্দুর রশিদ সিদ্দিকী — বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণের প্রকৃতি: সাঁওতাল উপজাতি সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ, পি-এইচ ডি থিসিস, রা.বি, ১৯৯৭।

শাহানা কায়েস — রাজশাহী জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন: একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা, এম. ফিল থিসিস, আইবিএস, রা.বি, ১৯৯৫।

আব্দুল মান্নান — কারিতাস - রাজশাহী অঞ্চল, ফিল্ড ওয়ার্ক রিপোর্ট, শিক্ষা বর্ষ - ১৯৮৫-৮৬, সমাজ কর্ম বিভাগ, রা.বি।

ফরহাদ হোসেন — বাংলাদেশে খ্রীস্টান মিশনারীদের তৎপরতা ও আমাদের সমাজ, ফিল্ড ওয়ার্ক রিপোর্ট, শিক্ষা বর্ষ - ১৯৯৫-৯৬, সমাজ কর্ম বিভাগ, রা.বি।

সাময়িকী

বরেন্দ্রদূত (রাজশাহী ধর্ম প্রদেশের মাসিক মুখপাত্র), ৬ষ্ট বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০১।

পাক্ষিক প্রহরী দূর্গ, ১৫ জুলাই ১৯৯৯

ইনসাইড আউট (প্রেসবিটারিয়ান সংবাদ সাময়িকী), ইস্যু নং ২০।

রাজশাহী এসোসিয়েশন পত্রিকা, জুলাই, ১৯৮৭।

শিক্ষাবার্তা (এ এন রাশেদা সম্পাদিত) নির্বাচিত রচনা, ১৯৯৮।

Baptist Quaterly, July ১৯৬৬.

বিনিময় (কারিতাস উন্নয়ন শিক্ষা কার্যক্রমের দ্বিবার্ষিক মুখপত্র), কারিতাস, ঢাকা, জুলাই ১৯৯২।

কারিতাস সংগঠনের জাতীয় সম্মেলনসমূহের প্রতিবেদন সংকলন, কারিতাস, ঢাকা, ১৯৯৩।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর- ডিসেম্বর, ১৯৮৫।

সাঁওতাল মন্ডলীর সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ২০০০ জুবিলী বছরের স্মরণিকা, (সৌরভ ফালিয়া ও অন্যান্য সম্পাদিত), রাজশাহী, মার্চ ২০০০।

রজত জয়ন্তী স্মরণিকা, ডাঃ এলিজাবেথ কনান মেমোরিয়াল নার্সিং ইনস্টিটিউট, খ্রিস্টিয়ান মিশন হাসপাতাল, রাজশাহী, ১৯৯৯।

A Brief History of Christian Mission Hospital, Rajshahi, By its medical superintendent, তারিখ বিহীন।

www.pathagar.com

প্রকাশিত রিপোর্ট

বার্ষিক রিপোর্ট, ২০০০, রাজশাহী রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, রাজশাহী।
বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯১- ১৯৯২, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল ।
এডাব ডাইরেক্টরী, ১৯৯৬ - ১৯৯৭, ২০০০।
এডাব , রাজশাহীর বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৮।

পত্র পত্রিকা

মাসিক ঢাকা ডাইজেস্ট, ১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৯।
সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৩ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬।
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ লা আগষ্ট, ২০০০।
দৈনিক বাংলা, ২৫ শে জুন, ১৯৯৪।
দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৯ শে জুলাই, ১৯৯২।
দৈনিক সংগ্রাম, ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।
দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ ই নভেম্বর, ১৯৯৯, ৬ ই নভেম্বর, ১৯৯৯, ৪ ঠা এপ্রিল, ১৯৯৯।
দৈনিক প্রথম প্রভাত, ৯ ই অক্টোবর, ২০০০ ।

বিবিধ পরিচিতি পত্র

কারিতাসের পরিচিতি পত্র, তারিখ বিহীন।
এ্যাডভেনটিস্ট ইন্টারন্যাশনাল মিশন স্কুলের পরিচিতি পত্র, রাজশাহী, ২০০০।
কুষ্ঠ ও যক্ষা রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত ডোমিয়েন ফাউন্ডেশনের পরিচিতি পত্র, রাজশাহী, তারিখ বিহীন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হারুন-অর রশিদ সরকার

(একাডেমিক নাম মোঃ হারুন-অর রশিদ) জন্ম রংপুরের পীরগঞ্জ থানাধীন দুরামিঠিপুর গ্রামে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে অনার্স, মাস্টার্স ও এমফিল ডিগ্রীপ্রাপ্ত। বর্তমানে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সুলতানী শাসনামলে বাংলার অর্থব্যবস্থা ১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ' শিরোনামে পিএইচডি ডিগ্রী লাভের জন্য গবেষণারত। পেশায় ব্যাংকার, ঝোঁক সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি। প্রতিষ্ঠাতা প্রধান সম্পাদক, মাসিক নির্ঝর। সাবেক পরিচালক, বিকল্প সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংসদ, সন্দীপন সাহিত্য পরিষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যমঞ্চ, প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-আহবায়ক, দিনাজপুর সংস্কৃতিকেন্দ্র।

গবেষণার পাশাপাশি একজন গল্পকার, কবি ও ছড়াকার হিসেবেও তিনি পরিচিত। বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখে যাচ্ছেন ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের গল্প, কবিতা ও ছড়া। ছোট গল্পের বিষয় বর্ণনায় তিনি ইতোমধ্যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। নাগরিক জীবনের পাওয়া না পাওয়া, জীবনের জটিলতা, আনন্দ-বেদনাকে উপজীব্য করে লিখিত তার ছোট গল্পগুলি সাধারণ পাঠকের মন ছুঁয়ে যাবে, সন্দেহ নেই। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'পদ্মাপাড়ের গল্প' (যৌথ, ২০০৭)।

www.pathagar.com

ISBN 984-300-000267-1

রাজশাহীর আদিবাসী সম্প্রদায় : ধর্মান্তর ও সাংস্কৃতিক সংকট
হারুন-অর রশিদ সরকার
প্রচ্ছদ : মো. ইয়াহিয়া সেলিম
মূল্য : আশি টাকা

একটি পরিলেখ প্রকাশনা